Shakil Mahmud • Research Monograph

SHAKIL MAHMUD EDITORIAL & RESEARCH MONOGRAPHS

চেতনার মহাবিকাশ

প্রাচীন ট্রিপ্যানিং ও কার্তেজিয়ান দ্বৈতবাদ থেকে কাহালের নিউরন মতবাদ, বিভাজিত মস্তিষ্ক, কোয়ালিয়ার রহস্য এবং কোয়ান্টাম চেতনা ও এআই সেনশিয়েন্সের মহাকাব্য।

SHAKIL MAHMUD

গবেষক ও লেখক

SHAKIL MAHMUD EDITORIAL & RESEARCH SERIES

প্রথম সংকলিত সংস্করণ • ঢাকা ও সিঙ্গাপুর • ২০২৬

চেতনার মহাবিকাশ

প্রাচীন ট্রিপ্যানিং ও কার্তেজিয়ান দ্বৈতবাদ থেকে কাহালের নিউরন মতবাদ, বিভাজিত মস্তিষ্ক, কোয়ালিয়ার রহস্য এবং কোয়ান্টাম চেতনা ও এআই সেনশিয়েন্সের মহাকাব্য।

LIBRARY & CATALOGING-IN-PUBLICATION DATA

Title: চেতনার মহাবিকাশ
Author: Shakil Mahmud
Series: Shakil Mahmud Editorial & Research Series (Monograph Collection)
Subjects: Science -- History -- Philosophy -- Mathematics -- Civilization
Published: Dhaka & Singapore, 2026
Format: Digital Monograph Offprint (PDF) • Complete 20-Part Collected Edition
Permanent URI: https://shakilmahmud.com/series/consciousness/

প্রস্তাবিত সাইটেশন:
Mahmud, Shakil. (2026). *চেতনার মহাবিকাশ: The Complete 20-Part Collected Monograph*. Shakil Mahmud Research Series. https://shakilmahmud.com/series/consciousness/

Open Scholarly Access: This collected monograph is published under Open Scholarly Access for personal study, academic citation, university pedagogy, and non-commercial research.

© 2026 Shakil Mahmud. All rights reserved. Typeset and published at Dhaka and Singapore.

Shakil Mahmud • Research Monograph

তাত্ত্বিক ভূমিকা

ভূমিকা: জ্ঞানের একীভূত রূপরেখা

❖

অচেতন বস্তু কীভাবে ব্যক্তিগত অনুভূতি ও আত্মসচেতনতার জন্ম দেয়? কার্তেজিয়ান দ্বৈতবাদ থেকে কাহালের নিউরন ডকট্রিন, বিভাজিত মস্তিষ্ক, ইন্টিগ্রেটেড ইনফরমেশন থিওরি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অনুভূতির সীমানা পর্যন্ত—বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ অমীমাংসিত রহস্যের এক গভীর তাত্ত্বিক অনুসন্ধান।

এই গবেষণামূলক কাজের উদ্দেশ্য কেবল তথ্য উপস্থাপন নয়, বরং চিন্তার গভীর বিকাশকে পাঠকের সামনে উন্মোচন করা। প্রতিটি পরিচ্ছদ এক একটি যুগান্তকারী বৌদ্ধিক সংকটের সমাধান হিসেবে কীভাবে আবির্ভূত হয়েছে, তা এখানে পদ্ধতিগতভাবে লিপিবদ্ধ করা হলো।

— Shakil Mahmud
Dhaka & Singapore, 2026

অধ্যায় সূচি

সূচিপত্র

প্রথম পর্যায়: প্রাচীন ও শাস্ত্রীয় যুগ

খণ্ড ১ — প্রাচীন মন এবং আত্মার অবস্থান — ট্রিপ্যানিং ও প্রাচীন মিশর থেকে অ্যারিস্টটল ও গ্যালেন — 563 শব্দ
প্রাচীন মন এবং আত্মার অবস্থান — ট্রিপ্যানিং ও প্রাচীন মিশর থেকে অ্যারিস্টটল ও গ্যালেন

খণ্ড ২ — কার্তেজিয়ান দ্বৈতবাদ — রনে দেকার্ত এবং দেহের ভেতরের অদৃশ্য আত্মা — 573 শব্দ
কার্তেজিয়ান দ্বৈতবাদ — রনে দেকার্ত এবং দেহের ভেতরের অদৃশ্য আত্মা

খণ্ড ৩ — রূপালী রঞ্জন ও নিউরন মতবাদ — সান্তিয়াগো রামোন ই কাহাল এবং ক্যামিলো গলগি — 578 শব্দ
রূপালী রঞ্জন ও নিউরন মতবাদ — সান্তিয়াগো রামোন ই কাহাল এবং ক্যামিলো গলগি

খণ্ড ৪ — বৈদ্যুতিক অর্কেস্ট্রা — অ্যাকশন পটেনশিয়াল, হজকিন-হাক্সলে এবং জায়ান্ট স্কুইড অ্যাক্সন — 740 শব্দ
বৈদ্যুতিক অর্কেস্ট্রা — অ্যাকশন পটেনশিয়াল, হজকিন-হাক্সলে এবং জায়ান্ট স্কুইড অ্যাক্সন

খণ্ড ৫ — রাসায়নিক ফিসফিসানি — নিউরোট্রান্সমিটার, সাইন্যাপস এবং অনুভূতির জৈবকাঠামো — 489 শব্দ
রাসায়নিক ফিসফিসানি — নিউরোট্রান্সমিটার, সাইন্যাপস এবং অনুভূতির জৈবকাঠামো

দ্বিতীয় পর্যায়: মধ্যযুগীয় রূপান্তর

খণ্ড ৬ — কর্টেক্সের মানচিত্রায়ন — ব্রোকা, ভের্নিক, ফিনিয়াস গেজ এবং মস্তিষ্কের মডুলার কাঠামো — 589 শব্দ
কর্টেক্সের মানচিত্রায়ন — ব্রোকা, ভের্নিক, ফিনিয়াস গেজ এবং মস্তিষ্কের মডুলার কাঠামো

খণ্ড ৭ — বিভক্ত মস্তিষ্কের রহস্য — রজার স্পেরি, মাইকেল গাজানিগা এবং দ্বিখণ্ডিত সত্তা — 854 শব্দ
বিভক্ত মস্তিষ্কের রহস্য — রজার স্পেরি, মাইকেল গাজানিগা এবং দ্বিখণ্ডিত সত্তা

খণ্ড ৮ — স্মৃতির মহাযন্ত্র — পেশেন্ট এইচ.এম., ব্রেন্ডা মিলনার এবং হিপোক্যাম্পাস — 577 শব্দ
স্মৃতির মহাযন্ত্র — পেশেন্ট এইচ.এম., ব্রেন্ডা মিলনার এবং হিপোক্যাম্পাস

খণ্ড ৯ — পরিবর্তনশীল মস্তিষ্ক — নিউরোপ্লাস্টিসিটি, নিউরোজেনেসিস এবং এরিক ক্যান্ডেলের সি-স্লাগ — 515 শব্দ
পরিবর্তনশীল মস্তিষ্ক — নিউরোপ্লাস্টিসিটি, নিউরোজেনেসিস এবং এরিক ক্যান্ডেলের সি-স্লাগ

খণ্ড ১০ — পূর্বাভাসমূলক মস্তিষ্ক — কার্ল ফ্রিস্টন, ফ্রি এনার্জি নীতি এবং হেলমহোল্টজের অবচেতন অনুমান — 457 শব্দ
পূর্বাভাসমূলক মস্তিষ্ক — কার্ল ফ্রিস্টন, ফ্রি এনার্জি নীতি এবং হেলমহোল্টজের অবচেতন অনুমান

তৃতীয় পর্যায়: আধুনিক বিপ্লব ও বিজ্ঞান

খণ্ড ১১ — চেতনার কঠিন সমস্যা — ডেভিড চালমার্স, থমাস নাগেল এবং কোয়ালিয়ার রহস্য — 2,546 শব্দ
চেতনার কঠিন সমস্যা — ডেভিড চালমার্স, থমাস নাগেল এবং কোয়ালিয়ার রহস্য

খণ্ড ১২ — চেতনার নিউরাল সংযোগ (NCC) — ফ্রান্সিস ক্রিক, ক্রিস্টফ কক এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান — 619 শব্দ
চেতনার নিউরাল সংযোগ (NCC) — ফ্রান্সিস ক্রিক, ক্রিস্টফ কক এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

Shakil Mahmud • Research Monograph

খণ্ড ১৩	গ্লোবাল ওয়ার্কস্পেস তত্ত্ব — বার্নার্ড বার্স, স্তানিস্লাস দেহান এবং চেতনার আলো *গ্লোবাল ওয়ার্কস্পেস তত্ত্ব — বার্নার্ড বার্স, স্তানিস্লাস দেহান এবং চেতনার আলো*	624 শব্দ
খণ্ড ১৪	ইন্টিগ্রেটেড ইনফরমেশন থিওরি (IIT) — জিউলিও তননি এবং সচেতনতার ফাই (Φ) *ইন্টিগ্রেটেড ইনফরমেশন থিওরি (IIT) — জিউলিও তননি এবং সচেতনতার ফাই (Φ)*	660 শব্দ
খণ্ড ১৫	কোয়ান্টাম মন — রজার পেনরোজ, স্টুয়ার্ট হ্যামারফ এবং মাইক্রোটিউবিউলের অর্ক-ওআর *কোয়ান্টাম মন — রজার পেনরোজ, স্টুয়ার্ট হ্যামারফ এবং মাইক্রোটিউবিউলের অর্ক-ওআর*	550 শব্দ

চতুর্থ পর্যায়: সমকালীন যুগ ও ভবিষ্যতের দিগন্ত

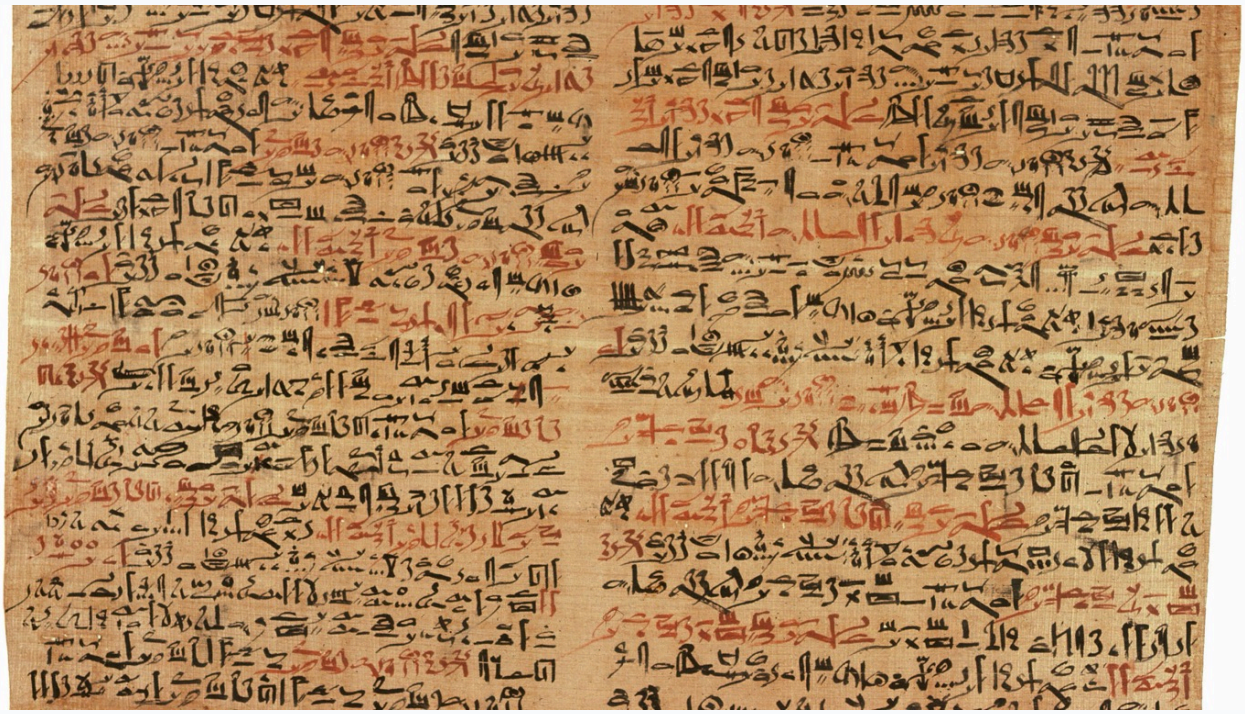
খণ্ড ১৬	স্বপ্নময় মন — রেম ঘুম, স্মৃতি সংহতকরণ এবং রাত্রিকালীন হ্যালুসিনেশন *স্বপ্নময় মন — রেম ঘুম, স্মৃতি সংহতকরণ এবং রাত্রিকালীন হ্যালুসিনেশন*	895 শব্দ
খণ্ড ১৭	পরিবর্তিত চেতনা — সাইকেডেলিকস, এন্ট্রপিক ব্রেন এবং ডিফল্ট মোড নেটওয়ার্ক *পরিবর্তিত চেতনা — সাইকেডেলিকস, এন্ট্রপিক ব্রেন এবং ডিফল্ট মোড নেটওয়ার্ক*	454 শব্দ
খণ্ড ১৮	প্রাণিজগতের চেতনা — অক্টোপাসের ভিনগ্রহী মন, কাকের বুদ্ধি এবং কেমব্রিজ ঘোষণা *প্রাণিজগতের চেতনা — অক্টোপাসের ভিনগ্রহী মন, কাকের বুদ্ধি এবং কেমব্রিজ ঘোষণা*	719 শব্দ
খণ্ড ১৯	ব্রেইন-কম্পিউটার ইন্টারফেস (BCI) — নিউরালিংক, ইন্ট্রাকর্টিক্যাল প্রোব এবং সাইবারনেটিক মন *ব্রেইন-কম্পিউটার ইন্টারফেস (BCI) — নিউরালিংক, ইন্ট্রাকর্টিক্যাল প্রোব এবং সাইবারনেটিক মন*	655 শব্দ
খণ্ড ২০	কৃত্রিম চেতনা — এআই সেনশিয়েন্স, ব্রেন ইমুলেশন এবং ২০২৬ সালের নতুন দিগন্ত *কৃত্রিম চেতনা — এআই সেনশিয়েন্স, ব্রেন ইমুলেশন এবং ২০২৬ সালের নতুন দিগন্ত*	2,430 শব্দ

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • প্রথম খণ্ড

প্রাচীন মন এবং আত্মার অবস্থান — ট্রিপ্যানিং ও প্রাচীন মিশর থেকে অ্যারিস্টটল ও গ্যালেন

প্রাচীন মন এবং আত্মার অবস্থান — ট্রিপ্যানিং ও প্রাচীন মিশর থেকে অ্যারিস্টটল ও গ্যালেন

563 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ১: *এডউইন স্মিথ প্যাপিরাস: মানব মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্কের আঘাতের চিকিৎসার প্রাচীনতম ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিল।*

চিন্তার রাসায়নিক সমীকরণ বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নিউরাল নেটওয়ার্ক তৈরির বহু পূর্বে মানুষ এক মৌলিক অস্তিত্ববাদী প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিল: আমাদের চেতনা, অনুভূতি আর 'আমি' সত্তার আসল বাসস্থান কোথায়? মাথার খুলির কঠিন অস্থিকাঠামোর ভেতরে, নাকি বুকের মাঝে স্পন্দিত উষ্ণ হৃদপিণ্ডের কুঠুরিতে? নিউরোসায়েন্সের ইতিহাস আধুনিক কোনো ল্যাবরেটরিতে শুরু হয়নি; এর সূচনা হয়েছিল নব্যপ্রস্তর যুগের গুহায় যেখানে চকমকি পাথরের ছুরি দিয়ে জীবন্ত মানুষের খুলিতে গোল ছিদ্র করা হতো, আর প্রাচীন মিশরের প্যাপিরাসে যেখানে মানব ইতিহাসের পাতায় প্রথমবারের মতো লিপিবদ্ধ হয়েছিল 'মস্তিষ্ক' শব্দটি।

নব্যপ্রস্তর যুগের ট্রিপ্যানিং: প্রাগৈতিহাসিক মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচার

ফ্রান্স, পেরু এবং উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজে দশ থেকে চার হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দের শত শত প্রাচীন মানুষের খুলি পাওয়া গেছে যাতে অত্যন্ত নিখুঁত বৃত্তাকার ছিদ্র রয়েছে—যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় **ট্রিপ্যানিং (Trepanation)**। আধুনিক সিটি স্ক্যান পরীক্ষায় দেখা গেছে সেই ছিদ্রগুলোর প্রান্তের হাড় পরবর্তীতে নতুন করে বৃদ্ধি পেয়েছে—যা প্রমাণ করে প্রস্তর যুগের রোগীরা এই মারাত্মক অস্ত্রোপচারের পরও বছরের পর বছর জীবিত ছিলেন!

Shakil Mahmud • Research Monograph

মাথায় তীব্র আঘাতের পর রক্তক্ষরণের চাপ কমানোর জন্যই হোক বা মৃগীরোগ ও অসহ্য মাথাব্যথার মতো ‘অশুভ আত্মাকে’ মুক্ত করার জন্যই হোক—ট্রিপ্যানিং হলো মানুষের প্রথম বাস্তব উপলব্ধি যে মস্তিষ্কের ভেতরেই লুকিয়ে রয়েছে চেতনা ও জীবনের মূল চাবিকাঠি।

এডউইন স্মিথ প্যাপিরাস: মস্তিষ্কের প্রথম লিখিত রূপ

১৮৬২ সালে লুক্সরে আবিষ্কৃত প্রায় ৪.৬৮ মিটার দীর্ঘ হায়ারোটিক প্যাপিরাস—যা খ্রিষ্টপূর্ব ১৭০০ অব্দের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি এবং ধারণা করা হয় খ্রিষ্টপূর্ব ২৭০০ অব্দের বিখ্যাত মিশরীয় চিকিৎসক ইমহোটেপের রচনা থেকে অনুলিপিত—তাতে মানবদেহের ৪৮টি জটিল আঘাতের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ রয়েছে।

এর ষষ্ঠ কেসে একজন মাথার খুলি ফাটা রোগীর বিবরণে বলা হয়েছে:

> *“যদি তুমি মাথায় গভীর ক্ষতের এমন এক রোগীকে পরীক্ষা করো যার খুলি ভেঙে মস্তিষ্ক উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে... তবে সেখানে তুমি গলিত তামার মতো ভাঁজ দেখতে পাবে এবং শিশুর মাথার নরম অংশের মতো সেখানে তোমার আঙুলের নিচে কিছু একটা ধকধক করে স্পন্দিত হতে অনুভব করবে।”*

এখানে প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসক প্রথম পর্যবেক্ষণ করেছিলেন মস্তিষ্কের মেনিনজেস পর্দা, রক্তপ্রবাহের স্পন্দন এবং সেরিব্রাল কর্টেক্সের খাঁজকাটা ভাঁজ। তবে মিশরীয় সংস্কৃতি ছিল পুরোপুরি **হৃদপিণ্ডকেন্দ্রিক**: মমি বানানোর সময় পরকালে ন্যায়ের পাল্লায় পরিমাপ করার জন্য হৃদপিণ্ডকে সযত্নে বুকে রাখা হতো, আর নাক দিয়ে তামার হুক ঢুকিয়ে মস্তিষ্ককে তরল করে ফেলে দেওয়া হতো স্রেফ অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য হিসেবে!

গ্রিক দর্শনের বিতর্ক: হৃদপিণ্ড বনাম মস্তিষ্ক

প্রাচীন গ্রিসে আত্মার অবস্থান নিয়ে চিন্তাবিদদের মধ্যে শুরু হলো তুমুল বিতর্ক:

- **অ্যালকমিয়ন (খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দ):** পশুর চোখের অপটিক স্নায়ু ব্যবচ্ছেদ করে ঘোষণা করলেন যে মস্তিষ্কই হলো অনুভূতি ও চিন্তার প্রধান সমন্বয়কারী কেন্দ্র।
- **হিপোক্রেটিস (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬০–৩৭০ অব্দ):** মৃগীরোগের ওপর লিখিত গ্রন্থে অন্ধবিশ্বাস উড়িয়ে দিয়ে বললেন: *“মানুষের জানা উচিত যে আনন্দ, উল্লাস, হাসি আর খেলাধুলা, তেমনি শোক, দুঃখ আর হতাশা—সবকিছু কেবল মস্তিষ্ক থেকেই উৎসারিত হয়... এই অঙ্গটির কারণেই আমরা উন্মাদ বা বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ি।”*
- **অ্যারিস্টটল (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৪–৩২২ অব্দ):** হিপোক্রেটিসের বিরোধিতা করে অ্যারিস্টটল মন বা আত্মার (Psyche) আসন বসালেন উষ্ণ রক্তে ভরা হৃদপিণ্ডে! তাঁর মতে রক্তহীন শীতল মস্তিষ্ক ছিল দেহের একটি সাধারণ রেডিয়েটর—যার কাজ হৃদপিণ্ডের জ্বলন্ত চুল্লির তাপকে ঠান্ডা করা!

গ্যালেন এবং ভেন্ট্রিকুলার মতবাদ

খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে রোমান সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াসের দরবারের বিখ্যাত গ্রিক চিকিৎসক গ্যালেন (Galen of Pergamon) শারীরস্থান ব্যবচ্ছেদ করে অ্যারিস্টটলের মতবাদকে ভুল প্রমাণ করলেন। তিনি দেখালেন শূকরের গলার নির্দিষ্ট স্নায়ু কাটলে হৃদপিণ্ডে কোনো স্পর্শ না করেই তার চিৎকার বন্ধ হয়ে যায়, আর মস্তিষ্কে চাপ দিলে জন্তুটি তাৎক্ষণিক সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে।

গ্যালেন প্রস্তাব করলেন **ভেন্ট্রিকুলার মতবাদ**: হৃদপিণ্ড থেকে আসা জীবনীশক্তি মস্তিষ্কের তলদেশে পরিমার্জিত হয়ে সূক্ষ্ম **অ্যানিম্যাল স্পিরিট** বা মানসিক বাষ্পে পরিণত হয়। এই বাষ্প মস্তিষ্কের ভেতরের তরলপূর্ণ গহ্বরে (ভেন্ট্রিকল) জমা হয়ে ফাঁপা স্নায়ুর মধ্য দিয়ে পেশীতে ছড়িয়ে পড়ে। যদিও তাঁর তত্ত্বের শারীরবৃত্তীয় রূপটি ভুল ছিল, তবুও গ্যালেন মানব ইতিহাসের জন্য চিরতরে প্রমাণ করে গেলেন: আমাদের চিন্তা, অনুভূতি ও সমস্ত চেতনার একমাত্র অধিপতি হলো মস্তিষ্ক।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "প্রাচীন মন এবং আত্মার অবস্থান — ট্রিপ্যানিং ও প্রাচীন মিশর থেকে অ্যারিস্টটল ও গ্যালেন"। চেতনার মহাবিকাশ, খণ্ড ১। https://shakilmahmud.com/bn/story-of-consciousness-part-01-ancient-mind-trepanation-egypt-galen-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • দ্বিতীয় খণ্ড

কার্তেজিয়ান দ্বৈতবাদ — রনে দেকার্ত এবং দেহের ভেতরের অদৃশ্য আত্মা

কার্তেজিয়ান দ্বৈতবাদ — রনে দেকার্ত এবং দেহের ভেতরের অদৃশ্য আত্মা

573 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ২: *রনে দেকার্ত (১৬৪৮): মন ও দেহের কার্তেজিয়ান দ্বৈতবাদের রূপকার।*

১৬৪১ সালে নেদারল্যান্ডসের এক কনকনে শীতের দিনে ফরাসি দার্শনিক ও গণিতবিদ রনে দেকার্ত প্রকাশ করেন তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থ *“মেডিটেশনস অন ফার্স্ট ফিলোসফি”*। সমস্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস ঝেড়ে ফেলে পরম সত্যের সন্ধানে দেকার্ত একে একে ইন্দ্রিয়ের সমস্ত জ্ঞানকে সন্দেহের কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন। অবশেষে তিনি পৌঁছালেন এমন এক অকাট্য ভিত্তিমূলে যা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না: *Cogito, ergo sum* (“আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি”)। কিন্তু চিন্তাশীল এই ‘আমি’ সত্তাকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দেকার্ত মহাবিশ্বকে দুটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন জগতে বিভক্ত করে ফেললেন—যার নাম **কার্তেজিয়ান দ্বৈতবাদ (Cartesian Dualism)**, যা জন্ম দিল দর্শন ও স্নায়ুবিজ্ঞানের সর্বকালের সবচেয়ে জটিল মন-দেহের ধাঁধা (Mind-Body Problem)।

মৌলিক সন্দেহ ও কজিটো (Cogito) আবিষ্কার

দেকার্ত ভাবলেন: আমাদের চোখ ও কান আমাদের প্রায়ই ভুল সংকেত দেয়; আমরা স্বপ্নে যা দেখি তা বাস্তব মনে হয়; এমনকি কোনো অতিপ্রাকৃত শয়তান হয়তো আমাদের সমস্ত ভাবনাকে ভ্রান্ত প্রমাণে নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু সবকিছুকে মিথ্যা ভাবার এই প্রক্রিয়ায় একটি সত্যকে কোনোভাবেই মুছে ফেলা যায় না: সন্দেহ করার জন্য চিন্তা করা প্রয়োজন, আর চিন্তা করতে হলে একজন চিন্তাকারীর অস্তিত্ব

থাকা অপরিহার্য:

> *"যখন আমি সবকিছুকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে চাইলাম, তখন দেখলাম এই সত্যটি যে আমি ভাবছি—সুতরাং আমি আছি—এতটাই সুদৃঢ় যে কোনো চরম সংশয়বাদীর যুক্তিতেও তা টলানো সম্ভব নয়। আমি নিঃসংশয়ে একে আমার অন্বেষিত দর্শনের প্রথম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করলাম।" — রনে দেকার্ত, ১৬৩৭*

চিন্তাশীল সত্তা (Res Cogitans) বনাম বস্তুগত সত্তা (Res Extensa)

এই উপলব্ধি থেকে দেকার্ত মহাবিশ্বকে দুটি মৌলিক উপাদানে ভাগ করলেন:

1. **রেস কজিটানস (Res Cogitans – চিন্তাশীল সত্তা):** আমাদের অমূর্ত মন বা আত্মা। এর কোনো ভর, আকার বা আয়তন নেই; এটি স্থানে কোনো জায়গা দখল করে না; কিন্তু এটি চিন্তা করতে পারে, ভালোবাসতে পারে এবং সচেতনতা অনুভব করে।
2. **রেস এক্সটেনসা (Res Extensa – বস্তুগত সত্তা):** আমাদের দৃশ্যমান ভৌত জগত এবং মানব শরীর। এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, ওজন রয়েছে; এটি মহাশূন্যে জায়গা দখল করে এবং জড়পদার্থের মেকানিক্যাল নিয়মে ঘড়ির কাঁটার মতো চলে।

দেকার্তের চোখে সমস্ত পশু-পাখি ছিল নিছক জৈবিক রোবট (Automata)—যাদের কোনো সত্যিকারের মন বা বেদনা অনুভব করার ক্ষমতা নেই। এমনকি মানুষের শরীরও ছিল এক হাইড্রোলিক কলকব্জা—যেখানে ফাঁপা স্নায়ুর মধ্য দিয়ে অ্যানিম্যাল স্পিরিট নামক তরল প্রবাহিত হয়ে পেশীগুলোকে পরিচালনা করে।

পাইনিয়াল গ্ল্যান্ড: মন ও দেহের মিলনমেলা

কিন্তু মন যদি পুরোপুরি অভৌত হয় আর শরীর যদি ভৌত পদার্থ হয়, তবে তারা একে অপরের সাথে কথা বলে কীভাবে? একটি অমূর্ত চিন্তা ("আমি হাত তুলতে চাই") কীভাবে বাস্তব মাংসপেশিতে টান ফেলে? আর চোখে আলো পড়ার ভৌত ঘটনা কীভাবে মনে অমূর্ত রঙের অনুভূতি জন্ম দেয়?

দেকার্ত মানব মস্তিষ্কের গঠন পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন যে এর প্রায় সমস্ত অংশ জোড়ায় জোড়ায় বিদ্যমান—দুটি গোলার্ধ, দুটি থ্যালামাস। কেবল মস্তিষ্কের তৃতীয় ভেন্ট্রিকলের কেন্দ্রস্থলে একটিমাত্র ক্ষুদ্র পাইনফলের মতো অঙ্গ এককভাবে বিরাজ করছে—**পাইনিয়াল গ্ল্যান্ড (Pineal Gland)** বা পিনাকৃতি গ্রন্থি।

দেকার্ত ঘোষণা করলেন যে এই পাইনিয়াল গ্ল্যান্ডই হলো আত্মার বসার সিংহাসন! তিনি ধারণা করলেন যে তরল বাষ্পের ভেতর ভাসমান এই ক্ষুদ্র গ্রন্থির ওপর আত্মা তার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে তরলের প্রবাহ দিক পরিবর্তন করে এবং মাংসপেশীকে চালিত করে, আর শরীর থেকে আসা সংকেত গ্রন্থিটিকে নাড়া দিয়ে আত্মায় অনুভূতির সঞ্চার করে।

যন্ত্রের ভেতরের ভূত (The Ghost in the Machine)

দেকার্তের এই ব্যাখ্যা তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে। বোহেমিয়ার রাজকুমারী এলিজাবেথ দেকার্তকে চিঠি লিখে প্রশ্ন করেছিলেন: ভর ও আয়তনহীন কোনো সত্তা কীভাবে বাস্তব বস্তুপিণ্ডকে স্পর্শ না করে বল প্রয়োগ করতে পারে? স্পিনোজা দ্বৈতবাদ প্রত্যাখ্যান করে বললেন মন ও পদার্থ আসলে একই পরম সত্তার দুটি ভিন্ন প্রকাশ।

১৯৪৯ সালে ব্রিটিশ দার্শনিক গিলবার্ট রাইল দেকার্তের এই মতবাদকে কটাক্ষ করে নাম দিলেন **"যন্ত্রের ভেতরের ভূত" (The Ghost in the Machine)**। বিজ্ঞান পরবর্তীতে পাইনিয়াল গ্রন্থিতে আত্মার উপস্থিতি বাতিল করলেও দেকার্তের রেখে যাওয়া মূল প্রশ্নটি আজও স্নায়ুবিজ্ঞানের প্রধানতম রহস্য হিসেবে অম্লান: কীভাবে একটি জড় বস্তুগত মস্তিষ্ক জন্ম দেয় প্রথম-পুরুষের আত্মসচেতন

Shakil Mahmud • Research Monograph

‘আমি’ রূপের?

❦

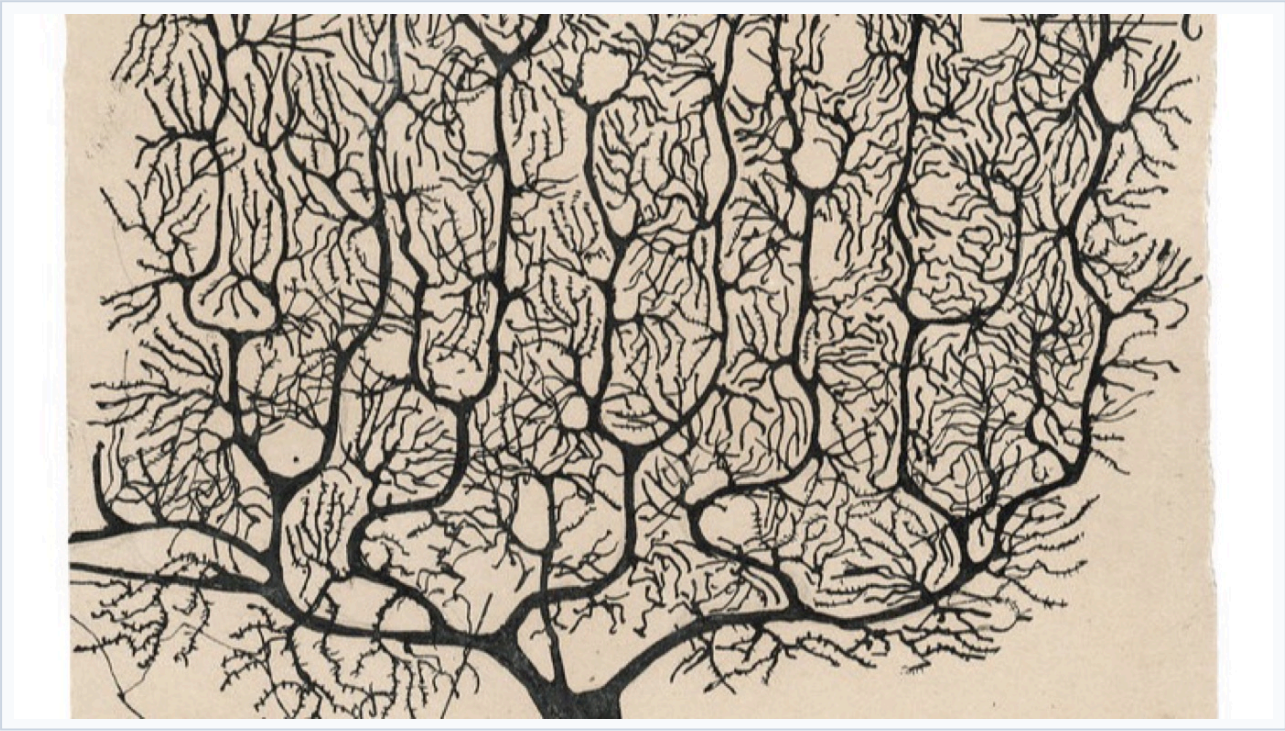
সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "কার্তেজিয়ান দ্বৈতবাদ — রনে দেকার্ত এবং দেহের ভেতরের অদৃশ্য আত্মা"। চেতনার মহাবিকাশ, খণ্ড ২।
https://shakilmahmud.com/bn/story-of-consciousness-part-02-cartesian-split-descartes-dualism-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • তৃতীয় খণ্ড

রূপালী রঞ্জন ও নিউরন মতবাদ — সান্তিয়াগো রামোন ই কাহাল এবং ক্যামিলো গলগি

রূপালী রঞ্জন ও নিউরন মতবাদ — সান্তিয়াগো রামোন ই কাহাল এবং ক্যামিলো গলগি

578 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ৩: *সান্তিয়াগো রামোন ই কাহালের মূল হিস্টোলজিক্যাল অঙ্কন: সেরেবেলামের পারকিনজে নিউরন ও নিউরন মতবাদের ভিত্তি।*

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এসে সাধারণ মাইক্রোস্কোপের কল্যাণে জীববিজ্ঞানে প্রমাণিত হয়েছিল যে মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গ—যকৃৎ, ফুসফুস, বৃক্ক ও মাংসপেশী—স্বতন্ত্র জৈবিক কোষ দিয়ে গঠিত (শোয়ান ও শ্লাইডেনের কোষ তত্ত্ব)। কিন্তু মস্তিষ্ক ছিল এক অমীমাংসিত ব্যতিক্রম। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে মস্তিষ্কের টিস্যুকে মনে হতো এক জটিল, তালগোল পাকানো অবিচ্ছিন্ন জাল। বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত ছিলেন যে মস্তিষ্ক হলো শিরা-উপশিরার মতো কোনো বিচ্ছিন্ন কোষহীন এক তরল নেটওয়ার্ক—যতক্ষণ না এক স্প্যানিশ শিল্পী ও রূপালী রঞ্জনের জাদুকর সান্তিয়াগো রামোন ই কাহাল উন্মোচন করলেন চেতনার আসল স্থপতি: স্বতন্ত্র **নিউরন**।

গলগির কালো রঞ্জন: রূপালী রাসায়নিক অলৌকিকত্ব

১৮৭৩ সালে ইতালির এক হাসপাতালের রান্নাঘরে বসে বিজ্ঞানী ক্যামিলো গলগি এক বিস্ময়কর রাসায়নিক রঞ্জন পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন—**লা রিয়াজিওনে নেরা (La Reazione Nera)** বা কালো বিক্রিয়া। পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট এবং সিলভার নাইট্রেটের দ্রবণে মস্তিষ্কের টিস্যু ভেজালে রূপালী ক্রিস্টাল স্নায়ুকোষের ভেতরে জমা হয়ে অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটায়।

Shakil Mahmud • Research Monograph

আজও বিজ্ঞানের কাছে এক রহস্য যে গলগির এই পদ্ধতি কোনো টিস্যুর মাত্র ১ থেকে ৩ শতাংশ কোষকে কালো রঙে রঞ্জিত করে, আর বাকি ৯৭ শতাংশ কোষকে রাখে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ! ফলে যেখানে পূর্বে দেখা যেত কালো ধোঁয়ার মতো এক জটলা, সেখানে স্বচ্ছ সোনালী পটভূমির ওপর কালো কালির মতো স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠল একক স্নায়ুকোষের সম্পূর্ণ অবয়ব—কোষদেহ, ডেনড্রাইটের সুউচ্চ শাখা-প্রশাখা আর দূর-দূরান্তে ছুটে যাওয়া অ্যাক্সনের সূক্ষ্ম সুতো।

কিন্তু গলগি তাঁর নিজের আবিষ্কারের ভুল ব্যাখ্যা করলেন। তিনি দাবি করলেন সমস্ত স্নায়ুর শাখা পরস্পরের সাথে মিশে তৈরি করেছে এক অবিচ্ছিন্ন জাল—**রেটিকুলার তত্ত্ব (Reticular Theory)**।

কাহাল: মাইক্রোস্কোপের ডন কুইক্সোট

১৮৮৭ সালে স্পেনের জারাগোজা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানাটমির অধ্যাপক সান্তিয়াগো রামোন ই কাহাল মাদ্রিদে প্রথমবারের মতো গলগির স্লাইড দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। শৈশবে চিত্রশিল্পী হতে চাওয়া কাহাল নিজের ঘরে একাকী ল্যাব বানিয়ে দিনরাত বারো ঘণ্টা মাইক্রোস্কোপে চোখ রেখে কাজ শুরু করলেন। তিনি গলগির রঞ্জন পদ্ধতিকে উন্নত করে ভ্রূণ ও নবজাত পাখির মস্তিষ্কে প্রয়োগ করলেন—যেখানে ফ্যাটের আবরণ স্নায়ুকে ঢেকে ফেলে না।

হাতে আঁকা শত শত অনবদ্য ড্রয়িংয়ের মাধ্যমে কাহাল দেখালেন যে স্নায়ুগুলোর শাখা কখনোই একে অপরের সাথে গলে মিশে যায় না। একটি স্নায়ুর অ্যাক্সন তার পাশের স্নায়ুর ডেনড্রাইটকে পরম মমতায় ছুঁয়ে থাকে, কিন্তু তাদের মাঝে সর্বদা থাকে এক অতিক্ষুদ্র ফাঁক:

> *“রেটিকুলার জালের সমর্থকদের চোখে মস্তিষ্ক ছিল এক দুর্ভেদ্য জঙ্গল; কিন্তু ধৈর্য আর রূপালী রঞ্জনের সাহায্যে সেই জঙ্গল নিজেকে উন্মোচন করল এমন এক স্বতন্ত্র বৃক্ষরাজি হিসেবে—যাদের শাখা-প্রশাখা কখনোই পরস্পরের সাথে মিশে একাকার হয় না।” — সান্তিয়াগো রামোন ই কাহাল*

নিউরন মতবাদ ও গতিশীল মেরুকরণের সূত্র

কাহালের এই আবিষ্কার আধুনিক স্নায়ুবিজ্ঞানের প্রধান ভিত্তিমূল স্থাপন করল—**নিউরন মতবাদ (The Neuron Doctrine)**:

1. **গাঠনিক একক:** নিউরন হলো স্নায়ুতন্ত্রের স্বাধীন গাঠনিক, শারীরবৃত্তীয় ও বিপাকীয় একক।
2. **স্পর্শ, কিন্তু বিলীন নয়:** নিউরনগুলো অবিচ্ছিন্ন নয়; তারা এক বিশেষ সংযোগস্থলের (পরবর্তীতে শেরিংটন কর্তৃক নামাঙ্কিত *সাইন্যাপস*) মাধ্যমে পরস্পরের সাথে সংকেত আদান-প্রদান করে।
3. **গতিশীল মেরুকরণের নীতি:** স্নায়ু সংকেত সর্বদা একদিকে চলে—**ডেনড্রাইট** সংকেত গ্রহণ করে কোষদেহে পাঠায়, আর কোষদেহ থেকে একক **অ্যাক্সন** হয়ে তা ছড়িয়ে পড়ে পরবর্তী কোষে।

কাহাল ডেনড্রাইটের ওপর ক্ষুদ্র মাশরুমের মতো কাঁটা (Dendritic Spines) আবিষ্কার করলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে নতুন কিছু শেখা মানে হলো এই সংযোগগুলোর শারীরিক পরিবর্তন ও নতুন কাঁটার জন্ম নেওয়া—যা আধুনিক মেমরি প্লাস্টিসিটির মূল ভিত্তি।

১৯০৬ সালের নোবেল পুরস্কার: ঐতিহাসিক দ্বৈরথ

১৯০৬ সালে স্নায়ুতন্ত্রের গঠনের ওপর গবেষণার জন্য ক্যামিলো গলগি এবং সান্তিয়াগো রামোন ই কাহালকে যৌথভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

স্টকহোমের মঞ্চে রচিত হলো চরম নাটকীয়তা। গলগি তাঁর নোবেল বক্তৃতায় অন্ধ অহমিকায় নিউরন তত্ত্বকে তীব্র আক্রমণ করে নিজের ভুল রেটিকুলার মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। আর তার পরপরই কাহাল উপস্থাপন করলেন শত শত নিখুঁত ড্রয়িং এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তি যা উপস্থিত বিজ্ঞানীদের মুগ্ধ করল। পরবর্তীতে ১৯৫০-এর দশকে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের নিচে ২০ থেকে ৪০ ন্যানোমিটারের সাইন্যাপ্টিক ফাঁক স্পষ্ট ধরা পড়ায় কাহালের তত্ত্ব চূড়ান্ত সত্য হিসেবে অমরত্ব লাভ করল: আমাদের সচেতন মন আসলে ৮৬ বিলিয়ন স্বতন্ত্র নিউরন তারার এক জীবন্ত মহাবিশ্ব।

❦

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "রূপালী রঞ্জন ও নিউরন মতবাদ — সান্তিয়াগো রামোন ই কাহাল এবং ক্যামিলো গলগি"। চেতনার মহাবিকাশ, খণ্ড ৩।
https://shakilmahmud.com/bn/story-of-consciousness-part-03-silver-stain-cajal-neuron-doctrine-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • চতুর্থ খণ্ড

বৈদ্যুতিক অর্কেস্ট্রা — অ্যাকশন পটেনশিয়াল, হজকিন-হাক্সলে এবং জায়ান্ট স্কুইড অ্যাক্সন

বৈদ্যুতিক অর্কেস্ট্রা — অ্যাকশন পটেনশিয়াল, হজকিন-হাক্সলে এবং জায়ান্ট স্কুইড অ্যাক্সন

740 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ৪: *ললিগো পিয়েলি স্কুইড: যার বিশালাকার অ্যাক্সন হজকিন-হাক্সলেকে অ্যাকশন পটেনশিয়ালের বৈদ্যুতিক রূপ উন্মোচনে সাহায্য করেছিল।*

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে কাহাল মস্তিষ্কের কোষের মানচিত্র আঁকলেও এক বিশাল মৌলিক রহস্য অধরা রয়ে গিয়েছিল: চিন্তা, দৃষ্টির অনুভূতি কিংবা আঙুল নাড়ানোর আদেশগুলো এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্নায়ুর তার দিয়ে বাস্তবে কীভাবে ছুটে বেড়ায়? ১৭৮০ সালে লুইজি গ্যালভানি স্থির বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ দিয়ে মৃত ব্যাঙের পা নাচিয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে জীবদেহে বিদ্যুতের প্রবাহ রয়েছে। ১৯৫২ সালে ইংল্যান্ডের প্লাইমাউথের মেরিন ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞানী অ্যালান হজকিন এবং অ্যান্ড্রু হাক্সলে মানব শারীরবিদ্যার অন্যতম সেরা গাণিতিক বিজয় অর্জন করলেন: আয়ন চ্যানেলের নৃত্য উন্মোচন করে আবিষ্কার করলেন **অ্যাকশন পটেনশিয়াল (Action Potential)**—যা মানুষের সচেতন মনের সার্বজনীন বাইনারি কোড।

আটলান্টিক স্কুইড ও বিশালাকার অ্যাক্সন

১৯৩০-এর দশকে স্তন্যপায়ী প্রাণী বা মানুষের স্নায়ুকোষের ভেতরের বিদ্যুৎ মাপা ছিল প্রযুক্তিগতভাবে অসম্ভব: মানুষের একটি একক অ্যাক্সনের ব্যাস মাত্র ১ থেকে ২ মাইক্রোমিটার—যার ভেতর কাঁচের ইলেকট্রোড ঢোকাতে গেলেই কোষটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত।

ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হলো উত্তর আটলান্টিকের বিশালাকার স্কুইড (*Loligo pealeii*)। ১৯৩৬ সালে ব্রিটিশ প্রাণিবিজ্ঞানী জে. জেড. ইয়ং আবিষ্কার করলেন যে আত্মরক্ষার্থে দ্রুত সাঁতার কাটার জন্য স্কুইডের দেহে রয়েছে এক অবিশ্বাস্য অঙ্গ: এর অ্যাক্সনগুলো প্রায় **১ মিলিমিটার (১০০০ মাইক্রোমিটার)** পর্যন্ত পুরু—মানুষের স্নায়ুর চেয়ে শত শত গুণ মোটা, যা খালি চোখেই স্বচ্ছ সেমাইয়ের সুতোর মতো দেখা যায়!

বিশ্রামকালীন মেমব্রেন পটেনশিয়াল: জীবন্ত ব্যাটারি

হজকিন ও হাক্সলে স্কুইডের অ্যাক্সনের ভেতরে রূপার প্রলেপযুক্ত অতি সূক্ষ্ম কাঁচের নল ঢুকিয়ে মেমব্রেনের দুই পাশের বৈদ্যুতিক বিভব মাপলেন। শান্ত অবস্থায় কোষের ভেতরের ভোল্টেজ ঋণাত্মক মান ধারণ করে থাকে:

$$V_m approx -৭০ text{মিলিভোল্ট}$$

এই বিশ্রামকালীন বিভব তৈরি হয় কোষ পর্দার দুই পাশে সোডিয়াম ও পটাসিয়াম আয়নের অসম ঘনত্বের কারণে, যা সোডিয়াম-পটাসিয়াম এটিপি পাম্পের (৩ $text{Na}^+$ text{বাইরে}/২ $text{K}^+$ text{ভেতরে}) মাধ্যমে সার্বক্ষণিক সচল থাকে:

1. **তীব্র ডিপোলারাইজেশন (সোডিয়ামের অন্তঃপ্রবাহ):** ভোল্টেজ-গেটেড সোডিয়াম চ্যানেলগুলো বিদ্যুৎ গতিতে খুলে যায়। সোডিয়াম আয়ন (Na^+) হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ে কোষের ভোল্টেজকে এক মিলিsecond-এ $+৪০ text{mV}$-এ পৌঁছে দেয়।
2. **রিপোলারাইজেশন (পটাসিয়ামের বহিঃপ্রবাহ):** সোডিয়াম চ্যানেল নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং পটাসিয়াম চ্যানেল খুলে গিয়ে K^+ আয়ন বাইরে বের হয়ে যায়—ফলে কোষ পুনরায় ঋণাত্মক বিভবে ফিরে আসে।
3. **রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড:** চ্যানেলগুলো সাময়িকভাবে বন্ধ থাকায় সংকেত কখনো পেছনে ফিরে যেতে পারে না; এটি আলোর মতো একমুখী গতিতে সামনের দিকে ছুটে যায়।

হজকিন-হাক্সলে সমীকরণমালা

১৯৫২ সালে *জার্নাল অব ফিজিওলজিতে* প্রকাশিত পাঁচটি গবেষণাপত্রে তাঁরা কোষের ঝিল্লিকে একটি সমতুল্য ইলেকট্রনিক সার্কিট হিসেবে উপস্থাপন করলেন:

$$I_m = C_m \frac{dV_m}{dt} + \bar{g}_{\text{Na}} m^3 h (V_m - E_{\text{Na}}) + \bar{g}_{\text{K}} n^4 (V_m - E_{\text{K}}) + g_L (V_m - E_L)$$

যেখানে m, h, n হলো আয়ন চ্যানেল খোলার সম্ভাব্যতা নির্দেশক চলক। হাতে ঘোরানো ক্যালকুলেটরে মাসের পর মাস হিসাব কষে হাক্সলে দেখালেন যে তাঁদের গাণিতিক সমীকরণের ফলাফল অসিলোস্কোপের পর্দায় দেখা বাস্তব স্নায়ু তরঙ্গের সাথে হুবহু মিলে যায়!

১৯৬৩ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত এই যুগান্তকারী আবিষ্কার প্রমাণ করল যে চেতনা বা চিন্তা কোনো অবাস্তব জাদুকরী শক্তি নয়; আমাদের সমস্ত স্মৃতি, কল্পনা আর ভালোবাসার অনুভূতি হলো কোষের জানালায় সোডিয়াম ও পটাসিয়াম আয়নের প্রতি সেকেন্ডে একশত মিটার বেগে ছুটে চলা এক সুমধুর মহাজাগতিক অর্কেস্ট্রা।

- **কোষের ভেতরে:** উচ্চ ঘনত্বের পটাসিয়াম ($textK^+$) এবং ঋণাত্মক প্রোটিন অণু।
- **কোষের বাইরে:** উচ্চ ঘনত্বের সোডিয়াম ($textNa^+$) ও ক্লোরাইড ($textCl^-$)—যা আদিম সমুদ্রের পানির অনুরূপ।

Shakil Mahmud • Research Monograph

প্রতিটি আয়নের ভারসাম্য বিভব নির্ধারিত হয় থার্মোডায়নামিক **নার্নস্ট সমীকরণ (Nernst Equation)** দ্বারা:

$$E_{textion} = fracRTzFlnleft(frac[textion]_{textout}[textion]_{textin}right)$$

ভোল্টেজ ক্ল্যাম্প ও অ্যাকশন পটেনশিয়ালের জন্ম

কেনেথ কোলের উদ্ভাবিত **ভোল্টেজ-ক্ল্যাম্প** প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা অ্যাক্সনের ভোল্টেজকে নির্দিষ্ট মানে ধরে রেখে মেমব্রেনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত আয়ন প্রবাহ মাপলেন। দেখা গেল কোষের ভোল্টেজ যখন উদ্দীপিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট থ্রেশহোল্ড ($-৫৫textmV$) অতিক্রম করে, তখন পলকের মধ্যে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের মতো এক অবিশ্বাস্য সংকেত তৈরি হয়:

1. **তীব্র ডিপোলারাইজেশন (সোডিয়ামের অন্তঃপ্রবাহ):** ভোল্টেজ-গেটেড সোডিয়াম চ্যানেলগুলো বিদ্যুৎ গতিতে খুলে যায়। সোডিয়াম আয়ন (Na^+) হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ে কোষের ভোল্টেজকে এক মিলিsecond-এ $+৪০textmV$-এ পৌঁছে দেয়।
2. **রিপোলারাইজেশন (পটাসিয়ামের বহিঃপ্রবাহ):** সোডিয়াম চ্যানেল নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং পটাসিয়াম চ্যানেল খুলে গিয়ে K^+ আয়ন বাইরে বের হয়ে যায়—ফলে কোষ পুনরায় ঋণাত্মক বিভবে ফিরে আসে।
3. **রিফ্র্যাক্টরি পিরিয়ড:** চ্যানেলগুলো সাময়িকভাবে বন্ধ থাকায় সংকেত কখনো পেছনে ফিরে যেতে পারে না; এটি আলোর মতো একমুখী গতিতে সামনের দিকে ছুটে যায়।

হজকিন-হাক্সলে সমীকরণমালা

১৯৫২ সালে *জার্নাল অব ফিজিওলজিতে* প্রকাশিত পাঁচটি গবেষণাপত্রে তাঁরা কোষের ঝিল্লিকে একটি সমতুল্য ইলেকট্রনিক সার্কিট হিসেবে উপস্থাপন করলেন:

$$I_m = C_m frac{dV_m}{dt} + bar{g}_{text{Na}} m^3 h (V_m – E_{text{Na}}) + bar{g}_{text{K}} n^4 (V_m – E_{text{K}}) + g_L (V_m – E_L)$$

যেখানে m, h, n হলো আয়ন চ্যানেল খোলার সম্ভাব্যতা নির্দেশক চলক। হাতে ঘোরানো ক্যালকুলেটরে মাসের পর মাস হিসাব কষে হাক্সলে দেখালেন যে তাঁদের গাণিতিক সমীকরণের ফলাফল অসিলোস্কোপের পর্দায় দেখা বাস্তব স্নায়ু তরঙ্গের সাথে হুবহু মিলে যায়!

১৯৬৩ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত এই যুগান্তকারী আবিষ্কার প্রমাণ করল যে চেতনা বা চিন্তা কোনো অবাস্তব জাদুকরী শক্তি নয়; আমাদের সমস্ত স্মৃতি, কল্পনা আর ভালোবাসার অনুভূতি হলো কোষের জানালায় সোডিয়াম ও পটাসিয়াম আয়নের প্রতি সেকেন্ডে একশত মিটার বেগে ছুটে চলা এক সুমধুর মহাজাগতিক অর্কেস্ট্রা।

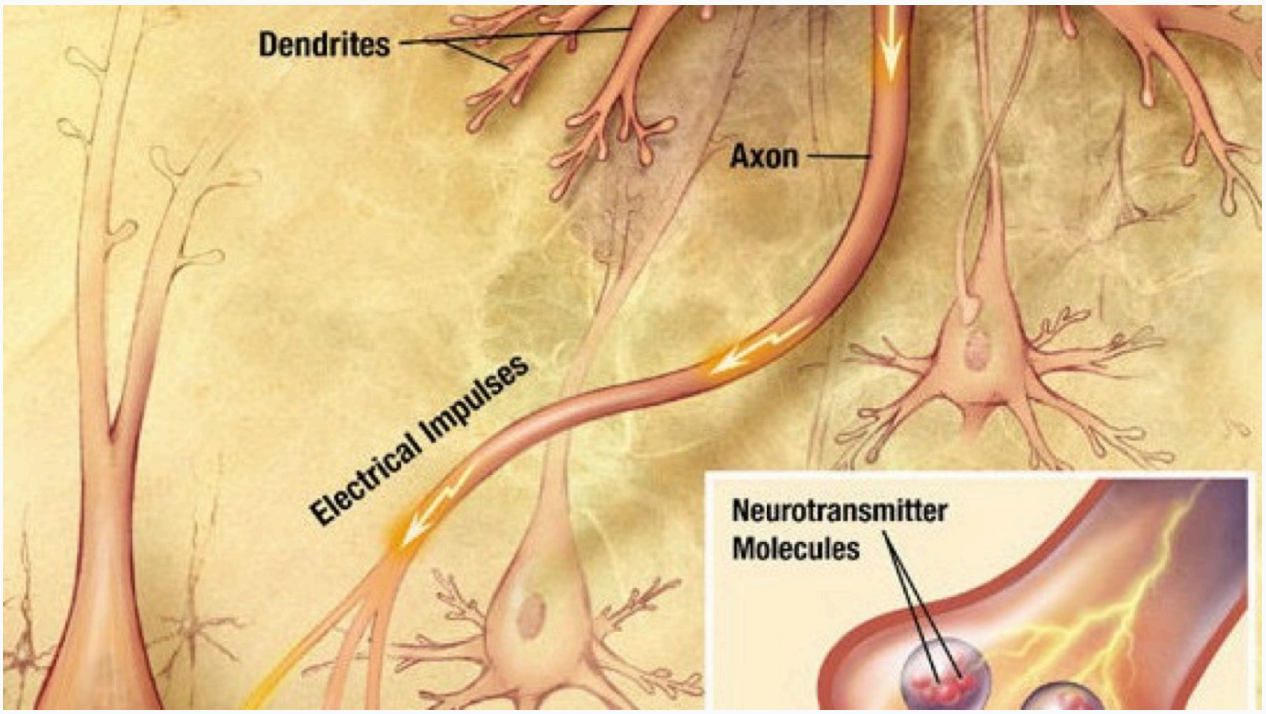
সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "বৈদ্যুতিক অর্কেস্ট্রা — অ্যাকশন পটেনশিয়াল, হজকিন-হাক্সলে এবং জায়ান্ট স্কুইড অ্যাক্সন"। চেতনার মহাবিকাশ, খণ্ড ৪। https://shakilmahmud.com/bn/story-of-consciousness-part-04-electrical-symphony-action-potentials-hodgkin-huxley-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • পঞ্চম খণ্ড

রাসায়নিক ফিসফিসানি — নিউরোট্রান্সমিটার, সাইন্যাপস এবং অনুভূতির জৈবকাঠামো

রাসায়নিক ফিসফিসানি — নিউরোট্রান্সমিটার, সাইন্যাপস এবং অনুভূতির জৈবকাঠামো

489 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ৫: *রাসায়নিক সাইন্যাপসের চিত্র: নিউরোট্রান্সমিটার ভেসিকল ও রিসেপ্টরের মাধ্যমে সংকেত বিনিময়।*

কাহালের সাইন্যাপস আবিষ্কারের পর স্নায়ুবিজ্ঞানীদের মাঝে দুই চরমপন্থী দলের লড়াই শুরু হলো: ‘স্পার্কস’ (Sparks) দল—যাঁদের দাবি ছিল স্নায়ুর ফাঁকা জায়গায় বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের মতো লাফিয়ে চলে; আর ‘সুপস’ (Soups) দল—যাঁদের বিশ্বাস ছিল সেখানে কোনো তরল রাসায়নিক সংকেত বাহক কাজ করে। ১৯২১ সালের এক পবিত্র ইস্টার সানডের ভোরে অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী অটো লোয়েভি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে ল্যাবরেটরিতে ছুটে গেলেন। তিনি এমন এক পরীক্ষা সম্পাদন করলেন যা চিরতরে বিতর্ক মিটিয়ে জন্ম দিল **নিউরোট্রান্সমিটার** বা চেতনার রাসায়নিক ভাষার।

লোয়েভির স্বপ্ন ও ভ্যাগাস পদার্থের আবিষ্কার

লোয়েভি দুটি তাজা ব্যাঙের হৃদপিণ্ডকে স্যালাইন দ্রবণে রাখলেন। প্রথম হৃদপিণ্ডে ভ্যাগাস স্নায়ু যুক্ত ছিল, আর দ্বিতীয়টিতে কোনো স্নায়ু ছিল না। লোয়েভি প্রথমটির ভ্যাগাস স্নায়ুতে বিদ্যুৎ দিয়ে হৃদস্পন্দন নাটকীয়ভাবে ধীর করে দিলেন। তারপর তিনি প্রথম পাত্রের দ্রবণ থেকে কিছু তরল ড্রপার দিয়ে তুলে দ্বিতীয় পাত্রে ঢাললেন।

Shakil Mahmud • Research Monograph

অলৌকিক ঘটনার মতো দ্বিতীয় হৃদপিণ্ডটিও বিন্দুমাত্র বৈদ্যুতিক সংযোগ ছাড়াই সাথে সাথে ধীর গতিতে স্পন্দিত হতে লাগল! প্রমাণিত হলো যে প্রথম স্নায়ুটি তরলে এমন এক রাসায়নিক পদার্থ নির্গমন করেছিল—লোয়েভি যার নাম দিলেন *ভাগাসস্টফ (Vagusstoff)*, যা পরবর্তীতে হেনরি ডেল কর্তৃক **অ্যাসিটাইলকোলিন** হিসেবে চিহ্নিত হয়।

সাইন্যাপ্টিক ফাঁকের আণবিক স্থাপত্য

পরবর্তীতে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখা গেল দুটি নিউরনের মধ্যবর্তী ফাঁক মাত্র **২০ থেকে ৪০ ন্যানোমিটার**। সংকেত প্রেরক প্রান্তটিতে জমে থাকে হাজার হাজার ক্ষুদ্র থলে বা **সাইন্যাপ্টিক ভেসিকল**—যার প্রতিটিতে ভরা থাকে প্রায় ৫০০০ নিউরোট্রান্সমিটার অণু:

- **গ্লুটামেট (Glutamate):** মস্তিষ্কের প্রধান উদ্দীপক মুদ্রা (৮০% সাইন্যাপস), যা স্মৃতি গঠন ও জটিল ভাবনার জ্বালানি যোগায়।
- **গাবা (GABA):** মস্তিষ্কের প্রধান শান্তিদাতা নিউরোট্রান্সমিটার, যা অতিরিক্ত উত্তেজনায় লাগাম টেনে মৃগীরোগ ও বিশৃঙ্খলা ঠেকায়।
- **ডোপামিন (Dopamine):** পুরস্কারের পূর্বাভাস, ইচ্ছা, মোটিভেশন ও অর্জনের পরম তৃপ্তির রাসায়নিক চালিকাশক্তি।
- **সেরোটোনিন (Serotonin):** মানসিক স্থৈর্য, সামাজিক মর্যাদা, আত্মবিশ্বাস এবং সুখের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণকারী অণু।
- **নরএপিনেফ্রিন (Norepinephrine):** সতর্কতা, তাৎক্ষণিক মনোযোগ ও সংবেদনশীলতার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

বাইনারি বৈদ্যুতিক সংকেতকে এই সমৃদ্ধ রাসায়নিক সুরে রূপান্তর করার মাধ্যমেই মস্তিষ্ক জড় পরমাণু দিয়ে তৈরি করতে পেরেছে মানব আত্মার এমন এক সুরভিত ক্যানভাস।

1. **ক্যালসিয়ামের প্রবেশ:** অ্যাকশন পটেনশিয়াল স্নায়ুর শেষ প্রান্তে পৌঁছালে ক্যালসিয়াম আয়ন ($textCa^{2+}$) হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ে।
2. **ভেসিকল ফিউশন:** ক্যালসিয়ামের ছোঁয়ায় স্নায়ুর থলেগুলো মেমব্রেনের সাথে মিশে গিয়ে চোখের পলকে তাদের ভেতর লুকিয়ে থাকা রাসায়নিক বার্তাবাহকদের ফাঁকা জায়গায় ছড়িয়ে দেয়।
3. **রিসেপ্টরে চাবি বসানো:** এই অণুগুলো ফাঁক অতিক্রম করে পরবর্তী নিউরনের দরজার তালা-চাবির মতো নির্দিষ্ট রিসেপ্টরে যুক্ত হয়—তাত্ক্ষণিক বিদ্যুৎ প্রবাহ তৈরি করে (আয়নোট্রপিক) অথবা কোষের ভেতরের রসায়ন বদলে দেয় (মেটাবোট্রপিক)।
4. **পরিস্কারকরণ:** এনজাইমের মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে এই রাসায়নিকগুলো ধুয়ে মুছে নেওয়া হয়—যাতে নতুন সংকেত গ্রহণের পথ উন্মুক্ত থাকে।

নিউরোট্রান্সমিটার পরিবার: অনুভূতির রসায়ন

আমাদের সচেতন জীবনের কোনো অনুভূতিই শূন্য থেকে আসে না; প্রতিটি অনুভূতির পেছনে কাজ করে নির্দিষ্ট কিছু রাসায়নিক বার্তাবাহক:

- **গ্লুটামেট (Glutamate):** মস্তিষ্কের প্রধান উদ্দীপক মুদ্রা (৮০% সাইন্যাপস), যা স্মৃতি গঠন ও জটিল ভাবনার জ্বালানি যোগায়।
- **গাবা (GABA):** মস্তিষ্কের প্রধান শান্তিদাতা নিউরোট্রান্সমিটার, যা অতিরিক্ত উত্তেজনায় লাগাম টেনে মৃগীরোগ ও বিশৃঙ্খলা ঠেকায়।
- **ডোপামিন (Dopamine):** পুরস্কারের পূর্বাভাস, ইচ্ছা, মোটিভেশন ও অর্জনের পরম তৃপ্তির রাসায়নিক চালিকাশক্তি।

- **সেরোটোনিন (Serotonin):** মানসিক স্থৈর্য, সামাজিক মর্যাদা, আত্মবিশ্বাস এবং সুখের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণকারী অণু।
- **নরএপিনেফ্রিন (Norepinephrine):** সতর্কতা, তাৎক্ষণিক মনোযোগ ও সংবেদনশীলতার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

বাইনারি বৈদ্যুতিক সংকেতকে এই সমৃদ্ধ রাসায়নিক সুরে রূপান্তর করার মাধ্যমেই মস্তিষ্ক জড় পরমাণু দিয়ে তৈরি করতে পেরেছে মানব আত্মার এমন এক সুরভিত ক্যানভাস।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "রাসায়নিক ফিসফিসানি — নিউরোট্রান্সমিটার, সাইন্যাপস এবং অনুভূতির জৈবকাঠামো"। চেতনার মহাবিকাশ, খণ্ড ৫।
https://shakilmahmud.com/bn/story-of-consciousness-part-05-chemical-whispers-synapses-neurotransmitters-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • ষষ্ঠ খণ্ড

কর্টেক্সের মানচিত্রায়ন — ব্রোকা, ভের্নিক, ফিনিয়াস গেজ এবং মস্তিষ্কের মডুলার কাঠামো

কর্টেক্সের মানচিত্রায়ন — ব্রোকা, ভের্নিক, ফিনিয়াস গেজ এবং মস্তিষ্কের মডুলার কাঠামো

589 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ৬: *ফিনিয়াস গেজ: ১৮৪৮ সালে যে লোহার রডটি তাঁর মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল লোব ভেদ করে ব্যক্তিত্ব বদলে দিয়েছিল, তা হাতে ধরে থাকা দাগেরোটাইপ।*

আমাদের মস্তিষ্ক কি এমন একটি অবিভাজ্য অঙ্গ যেখানে সমস্ত অংশ সমপরিমাণে সমস্ত কাজে অংশ নেয়—যেমনটি দাবি করেছিলেন ফরাসি বিজ্ঞানী ফ্লুরেন্স? নাকি সেরিব্রাল কর্টেক্স হলো শত শত বিশেষায়িত স্বাধীন কারখানার এক সুসংহত ফেডারেশন? উনবিংশ শতাব্দীতে এই প্রশ্নের উত্তর কোনো তাত্ত্বিক দর্শনের টেবিলে আসেনি; এর উত্তর এসেছিল চরম কিছু মর্মান্তিক মানবিক দুর্ঘটনার মাধ্যমে: আমেরিকার এক রেলওয়ে ফোরম্যানের মাথার ভেতর দিয়ে ছুটে যাওয়া লোহার রড এবং প্যারিসের হাসপাতালের এমন এক রোগী যিনি সব বুঝতে পারলেও মুখ দিয়ে কেবল একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করতে পারতেন।

ফ্রেনোলজির অপবিজ্ঞান: গলের দূরদর্শিতা ও চরম ভুল

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে ভিয়েনার চিকিৎসক ফ্রাঞ্জ জোসেফ গল **ফ্রেনোলজি (Phrenology)** নামক এক নতুন দর্শনের অবতারণা করলেন। গল একটি অনন্য দূরদর্শী প্রস্তাব দিয়েছিলেন: তিনি বললেন মস্তিষ্কই মনের একমাত্র অঙ্গ এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ ভালোবাসা, ভাষা, ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি কিংবা সততার মতো ভিন্ন ভিন্ন মানসিক গুণাবলীর জন্য নির্দিষ্ট।

কিন্তু গল এক হাস্যকর ভুল করলেন: তিনি দাবি করলেন মস্তিষ্কের এই অঞ্চলগুলোর আকার বাড়লে মাথার খুলির হাড়ে ঢিবি বা খাঁজ তৈরি হয়! ফলে মাথা হাতড়ে মানুষের চরিত্র নির্ধারণের এই অপবিজ্ঞান ভিক্টোরিয়ান যুগে হাসির খোরাক হলেও এটি রেখে গেল এক অমূল্য সত্য: **মস্তিষ্কের কাজের নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক বিভাজন (Cortical Localization)**।

ফিনিয়াস গেজ: আত্মার ভেতর দিয়ে ছুটে যাওয়া লোহার রড

১৮৪৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর আমেরিকার ভারমন্টে পঁচিশ বছর বয়সী রেলকর্মী ফিনিয়াস গেজ বারুদ ঠাসার কাজ করছিলেন। হঠাৎ এক স্ফুলিঙ্গে বারুদ বিস্ফোরিত হয়ে সোয়া তিন ফুট লম্বা এবং তেরো পাউন্ড ওজনের লোহার রড গেজের বাম গাল ফুঁড়ে তাঁর মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল লোব ভেদ করে খুলির চূড়া দিয়ে আশি ফুট দূরে ছিটকে পড়ল!

সবচেয়ে অবিশ্বাস্য বিষয় হলো গেজ মারা গেলেন না; কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি উঠে বসলেন এবং স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে লাগলেন। তাঁর স্মৃতি, বুদ্ধি, কথা বলা ও হাঁটার ক্ষমতা অবিকল অক্ষত ছিল। কিন্তু তাঁর ভেতরে ঘটে গেল এক ভুতুড়ে রূপান্তর: পূর্বে যিনি ছিলেন ভদ্র, দায়িত্বশীল ও পরিশ্রমী এক আদর্শ মানুষ—সেই গেজ পরিণত হলেন খামখেয়ালী, অসংযমী, আক্রমণাত্মক ও নীতিজ্ঞানহীন এক বিকারগ্রস্ত চরিত্রে। তাঁর চিকিৎসক বলেছিলেন: *“গেজ আর সেই গেজ নেই।”*

ফিনিয়াস গেজের এই ট্র্যাজেডি বিজ্ঞানের সামনে প্রথম উন্মোচন করল যে আমাদের **প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্সই** হলো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, সামাজিক নৈতিকতা, ব্যক্তিত্ব ও মানবিক সংযমের আসল স্নায়বিক আশ্রয়স্থল।

পল ব্রোকা এবং রোগী ‘ট্যান’

১৮৬১ সালে প্যারিসের বিসেত্রে হাসপাতালে ফরাসি সার্জন পল ব্রোকা একান্ন বছর বয়সী ভিক্টর লিবোর্নের সাক্ষাৎ পেলেন। দীর্ঘ একুশ বছর ধরে এই রোগীটি মানুষের সব কথা নিখুঁতভাবে বুঝতে পারতেন, কিন্তু নিজে কথা বলতে গেলে মুখ দিয়ে কেবল একটিমাত্র শব্দই বের হতো: *“ট্যান” (Tan)*!

লিবোর্নের মৃত্যুর পর ময়নাতদন্ত করে ব্রোকা দেখলেন তাঁর বাম সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ারের ফ্রন্টাল লোবের পেছনের অংশে এক স্পষ্ট ক্ষত—যা আজ বিশ্বজুড়ে **ব্রোকার এরিয়া (Broca’s Area)** নামে অমর:

> *“আমরা কথা বলি আমাদের বাম গোলার্ধ দিয়ে!” — পল ব্রোকা, ১৮৬১*

কার্ল ভের্নিক ও ভাষার বোধগম্যতা

১৮৭৪ সালে জার্মান স্নায়ুবিজ্ঞানী কার্ল ভের্নিক ঠিক বিপরীত এক রোগের সন্ধান পেলেন। তাঁর রোগীরা অনর্গল নির্ভুল ব্যাকরণে কথা বলে যেতে পারত, কিন্তু তাদের কথার কোনো অর্থ হতো না—স্রেফ অর্থহীন শব্দের খিচুড়ি! আর তারা অন্যের কোনো কথাই বুঝতে পারত না।

ভের্নিক দেখলেন এই ক্ষতটি রয়েছে বাম টেম্পোরাল লোবের পেছনভাগে—যা আজ **ভের্নিকের এরিয়া (Wernicke’s Area)** নামে পরিচিত। প্রমাণিত হলো ভাষা বোঝার কেন্দ্র এবং কথা বলার পেশী নিয়ন্ত্রণ করার কেন্দ্র দুটি সম্পূর্ণ পৃথক এবং তারা স্নায়ুর সেতু (Arcuate Fasciculus) দিয়ে একে অপরের সাথে যুক্ত।

Shakil Mahmud • Research Monograph

পেনফিল্ডের হোমুঙ্কুলাস: কর্টেক্সের মানব মানচিত্র

১৯৩০-এর দশকে মন্ট্রিয়ল নিউরোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটে ওয়াইল্ডার পেনফিল্ড জাগ্রত মৃগীরোগীদের মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচারের সময় মৃদু বিদ্যুৎ দিয়ে কর্টেক্সের প্রতিটি অংশ স্পর্শ করে আঁকলেন বিখ্যাত **হোমুঙ্কুলাস মানচিত্র (Cortical Homunculus)**।

দেখা গেল মস্তিষ্কের কর্টেক্সে শরীরের অঙ্গগুলোর জায়গা নির্ধারিত হয় শারীরিক আকারের ওপর নয়, বরং তাদের স্পর্শ ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার ওপর। ফলে আমাদের ঠোঁট, জিহ্বা ও হাতের আঙুলগুলোর জন্য মস্তিষ্কে বিশাল জায়গা বরাদ্দ রয়েছে, যেখানে পিঠ বা পায়ের পাতার জন্য বরাদ্দ অতি সামান্য। চেতনা কোনো অখণ্ড ধোঁয়াশা নয়—এটি বিশেষায়িত কর্টেক্স প্রদেশের এক নিখুঁত ও নান্দনিক ঐকতান।

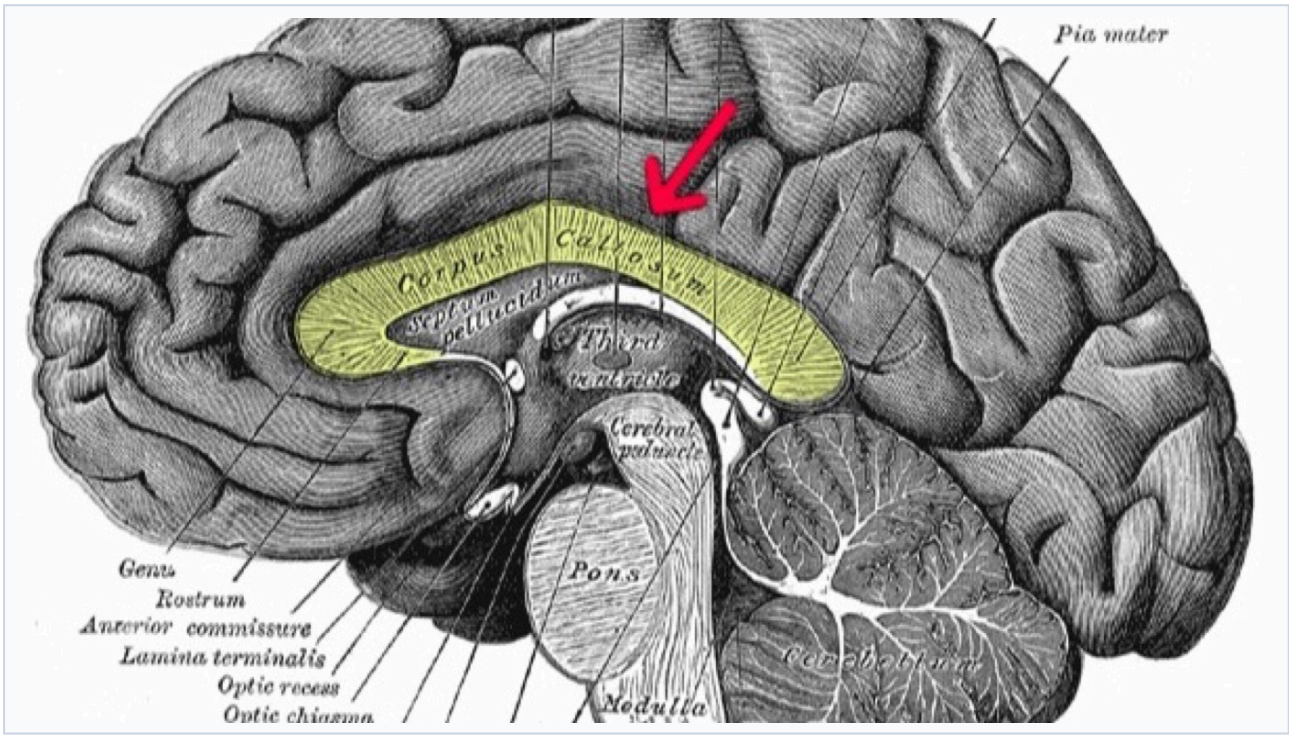
সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "কর্টেক্সের মানচিত্রায়ন — ব্রোকা, ভের্নিক, ফিনিয়াস গেজ এবং মস্তিষ্কের মডুলার কাঠামো"। চেতনার মহাবিকাশ, খণ্ড ৬। https://shakilmahmud.com/bn/story-of-consciousness-part-06-mapping-cortex-broca-wernicke-phineas-gage-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • সপ্তম খণ্ড

বিভক্ত মস্তিষ্কের রহস্য — রজার স্পেরি, মাইকেল গাজানিগা এবং দ্বিখণ্ডিত সত্তা

বিভক্ত মস্তিষ্কের রহস্য — রজার স্পেরি, মাইকেল গাজানিগা এবং দ্বিখণ্ডিত সত্তা

854 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ৭: *মানব মস্তিষ্কের কর্পাস ক্যালোসাম: দুই গোলার্ধের সংযোগকারী সেতু, যা বিভক্ত-মস্তিষ্কের গবেষণায় দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছিল।*

মানব অস্তিত্বের সবচেয়ে দৃঢ় অনুভূতি হলো আমাদের একীভূত ‘আমি’ সত্তা: আমরা মনে করি আমাদের সমস্ত চিন্তা, দৃষ্টি আর ইচ্ছাগুলো একটিমাত্র অখণ্ড সচেতন কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৬০-এর দশকে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে (Caltech) স্নায়ুবিজ্ঞানী রজার স্পেরি এবং তাঁর তরুণ ছাত্র মাইকেল গাজানিগা এমন কিছু রোগীর ওপর গবেষণা চালালেন যাঁদের তীব্র মৃগীরোগের চিকিৎসার জন্য মস্তিষ্কের দুই গোলার্ধের সংযোগকারী ২০ কোটি স্নায়ুর সেতু—**কর্পাস ক্যালোসাম (Corpus Callosum)**—অস্ত্রোপচার করে কেটে ফেলা হয়েছিল। তাঁদের আবিষ্কার মানব আত্মসচেতনতার ভিত্তিকে কাঁপিয়ে দিল: একটিমাত্র খুলির ভেতরে আসলে বাস করে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন সচেতন মন!

দুই গোলার্ধের সেতু: কর্পাস ক্যালোসাম

আমাদের মস্তিষ্ক শারীরবৃত্তীয়ভাবে দুটি সমান গোলার্ধে বিভক্ত, যা পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে এক বিশাল সাদা স্নায়ুর তার দিয়ে—কর্পাস ক্যালোসাম। সুস্থ মস্তিষ্কে প্রতি সেকেন্ডে ৪০০ কোটি সংকেত আদান-প্রদান করে এই দুই গোলার্ধ এমনভাবে কাজ করে যে আমাদের মনে হয় আমরা একটি একক সত্তা।

Shakil Mahmud • Research Monograph

মৃগীরোগের মারাত্মক খিঁচুনি এক গোলার্ধ থেকে অন্য গোলার্ধে ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে চিকিৎসকরা যখন এই সংযোগটি কেটে দিলেন, তখন সাধারণ দৃষ্টিতে রোগীদের মধ্যে কোনো দৃশ্যমান পরিবর্তন দেখা গেল না। তারা স্বাভাবিকভাবে কথা বলত, হাটত এবং খাবার খেত —ফলে অনেকে রসিকতা করে বলেছিলেন এই সেতুর কাজ বুঝি কেবল দুই গোলার্ধকে ঝুলিয়ে রাখা!

ক্যালটেকের বিভক্ত পর্দার বৈপ্লবিক পরীক্ষা

স্পেরি এবং গাজানিগা বুঝলেন সাধারণ জীবনে চোখের দ্রুত নড়াচড়ার কারণে দুই চোখ দিয়েই দুই গোলার্ধে তথ্য চলে যায়। তাঁরা এক বিশেষ টেকিস্টোস্কোপ পর্দা তৈরি করলেন যা চোখের পলকের চেয়েও দ্রুত সময়ে (এক সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগে) নির্দিষ্ট গোলার্ধে ছবি পাঠাতে পারে:

- ডান হাত (বাম গোলার্ধ) বেছে নিল একটি মুরগি।
- বাম হাত (ডান গোলার্ধ) বেছে নিল বরফ সরানোর বেলচা।

গাজানিগা যখন রোগীকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি বেলচা কেন বেছে নিলে?” কথা বলা বাম মস্তিষ্ক বিন্দুমাত্র স্বীকার করল না যে সে জানে না। সে তৎক্ষণাৎ বানিয়ে বানিয়ে এক কাল্পনিক গল্প সাজাল: *“আরে খুব সহজ! মুরগির পায়ের সাথে মুরগি মিলে, আর মুরগির খাঁচা পরিষ্কার করতে তো বেলচা লাগবেই!”*

গাজানিগা বাম মস্তিষ্কের এই মডিউলটির নাম দিলেন **ইন্টারপ্রেটার (The Interpreter)**। এর কাজ হলো আমাদের সমস্ত অবচেতন ও অজানা আচরণের পেছনে তাৎক্ষণিকভাবে একটি যৌক্তিক মিথ্যা গল্প বানিয়ে মনকে শান্ত রাখা!

দ্বিখণ্ডিত আত্মা ও স্পেরির নোবেল জয়

স্পেরি প্রমাণ করলেন ডান গোলার্ধ কোনো বোবা যান্ত্রিক মাংসপিণ্ড নয়; এটি স্থানিক জ্যামিতি, মুখমণ্ডল চেনা, গভীর অনুভূতি এবং স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী এক সম্পূর্ণ সচেতন মন। কিছু রোগীর ক্ষেত্রে দুই হাতের দ্বন্দ্ব এমন রূপ নিয়েছিল যে বাম হাত প্যান্ট পরে নিলে ডান হাত তা টেনে খুলে ফেলত, অথবা বাম হাত দিয়ে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরলে ডান হাত দিয়ে চড় মারত (এলিয়েন হ্যান্ড সিন্ড্রোম)!

> *“প্রতিটি গোলার্ধই আসলে নিজস্ব অধিকারে এক স্বাধীন সচেতন সত্তা—যা চিন্তা করে, উপলব্ধি করে, মনে রাখে, যুক্তি দেয় এবং অনুভূতি অনুভব করে।” — রজার স্পেরি, ১৯৭৪*

১৯৮১ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত এই আবিষ্কার দেকার্তের অখণ্ড আত্মার ধারণাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল। একটি সাধারণ অস্ত্রোপচারের ছুরিতে যদি মানুষের মন দুটি স্বাধীন সচেতনতায় বিভক্ত হয়ে যেতে পারে, তবে চেতনা কোনো অভৌত অলৌকিক আত্মা হতে পারে না—এটি আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়বিক সংযোগের ভেতর থেকে প্রস্ফুটিত হওয়া এক অপূর্ব জটিল সঙ্গীত।

- **ডান দৃষ্টি ক্ষেত্র:** সংকেত পাঠায় সরাসরি **বাম গোলার্ধে** (যা কথা বলতে পারে এবং ডান হাত নিয়ন্ত্রণ করে)।
- **বাম দৃষ্টি ক্ষেত্র:** সংকেত পাঠায় সরাসরি **ডান গোলার্ধে** (যা বোবা, কিন্তু বাম হাত নিয়ন্ত্রণ করে এবং জটিল জ্যামিতি বোঝে)।

যখন পর্দার ডানে *“RING”* শব্দটি দেখানো হলো, রোগী সঙ্গে সঙ্গে মুখে বলল: *“রিং”*। কিন্তু যখন বামে *“KEY”* শব্দটি দেখানো হলো, রোগী মুখ দিয়ে বলল: *“আমি কিছুই দেখিনি!”* কিন্তু যখন রোগীকে পর্দার আড়ালে না দেখে হাত দিয়ে বস্তু খুঁজে নিতে বলা হলো, রোগীর বাম হাত কোনো ভুল না করে টেবিলের ওপর থেকে চাবিটি তুলে নিল!

গাজানিগা যখন রোগীকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কেন চাবি তুলে নিলে?” কথা বলা বাম গোলার্ধ—যে চাবি দেখার কথা বিন্দুমাত্র জানত না—হতভম্ব হয়ে উত্তর দিল: *“আরে আমি তো জানি না, আমার আঙুল এমনিতেই এটা ধরে ফেলেছে!”*

বাম মস্তিষ্কের ইন্টারপ্রেটার (The Interpreter)

আরেকটি চমকপ্রদ পরীক্ষায় বাম গোলার্ধে দেখানো হলো মুরগির পা এবং ডান গোলার্ধে বরফাচ্ছন্ন বাড়ির ছবি। রোগীকে ছবির সাথে মিলিয়ে টেবিল থেকে বস্তু বেছে নিতে বলা হলো:

- ডান হাত (বাম গোলার্ধ) বেছে নিল একটি মুরগি।
- বাম হাত (ডান গোলার্ধ) বেছে নিল বরফ সরানোর বেলচা।

গাজানিগা যখন রোগীকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি বেলচা কেন বেছে নিলে?" কথা বলা বাম মস্তিষ্ক বিন্দুমাত্র স্বীকার করল না যে সে জানে না। সে তৎক্ষণাৎ বানিয়ে বানিয়ে এক কাল্পনিক গল্প সাজাল: *"আরে খুব সহজ! মুরগির পায়ের সাথে মুরগি মিলে, আর মুরগির খাঁচা পরিষ্কার করতে তো বেলচা লাগবেই!"*

গাজানিগা বাম মস্তিষ্কের এই মডিউলটির নাম দিলেন **ইন্টারপ্রেটার (The Interpreter)**। এর কাজ হলো আমাদের সমস্ত অবচেতন ও অজানা আচরণের পেছনে তাৎক্ষণিকভাবে একটি যৌক্তিক মিথ্যা গল্প বানিয়ে মনকে শান্ত রাখা!

দ্বিখণ্ডিত আত্মা ও স্পেরির নোবেল জয়

স্পেরি প্রমাণ করলেন ডান গোলার্ধ কোনো বোবা যান্ত্রিক মাংসপিণ্ড নয়; এটি স্থানিক জ্যামিতি, মুখমণ্ডল চেনা, গভীর অনুভূতি এবং স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী এক সম্পূর্ণ সচেতন মন। কিছু রোগীর ক্ষেত্রে দুই হাতের দ্বন্দ্ব এমন রূপ নিয়েছিল যে বাম হাত প্যান্ট পরে নিলে ডান হাত তা টেনে খুলে ফেলত, অথবা বাম হাত দিয়ে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরলে ডান হাত দিয়ে চড় মারত (এলিয়েন হ্যান্ড সিন্ড্রোম)!

> *"প্রতিটি গোলার্ধই আসলে নিজস্ব অধিকারে এক স্বাধীন সচেতন সত্তা—যা চিন্তা করে, উপলব্ধি করে, মনে রাখে, যুক্তি দেয় এবং অনুভূতি অনুভব করে।" — রজার স্পেরি, ১৯৭৪*

১৯৮১ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত এই আবিষ্কার দেকার্তের অখণ্ড আত্মার ধারণাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল। একটি সাধারণ অস্ত্রোপচারের ছুরিতে যদি মানুষের মন দুটি স্বাধীন সচেতনতায় বিভক্ত হয়ে যেতে পারে, তবে চেতনা কোনো অভৌত অলৌকিক আত্মা হতে পারে না—এটি আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়বিক সংযোগের ভেতর থেকে প্রস্ফুটিত হওয়া এক অপূর্ব জটিল সঙ্গীত।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "বিভক্ত মস্তিষ্কের রহস্য — রজার স্পেরি, মাইকেল গাজানিগা এবং দ্বিখণ্ডিত সত্তা"। চেতনার মহাবিকাশ, খণ্ড ৭।
https://shakilmahmud.com/bn/story-of-consciousness-part-07-split-brain-sperry-gazzaniga-divided-self-bn/

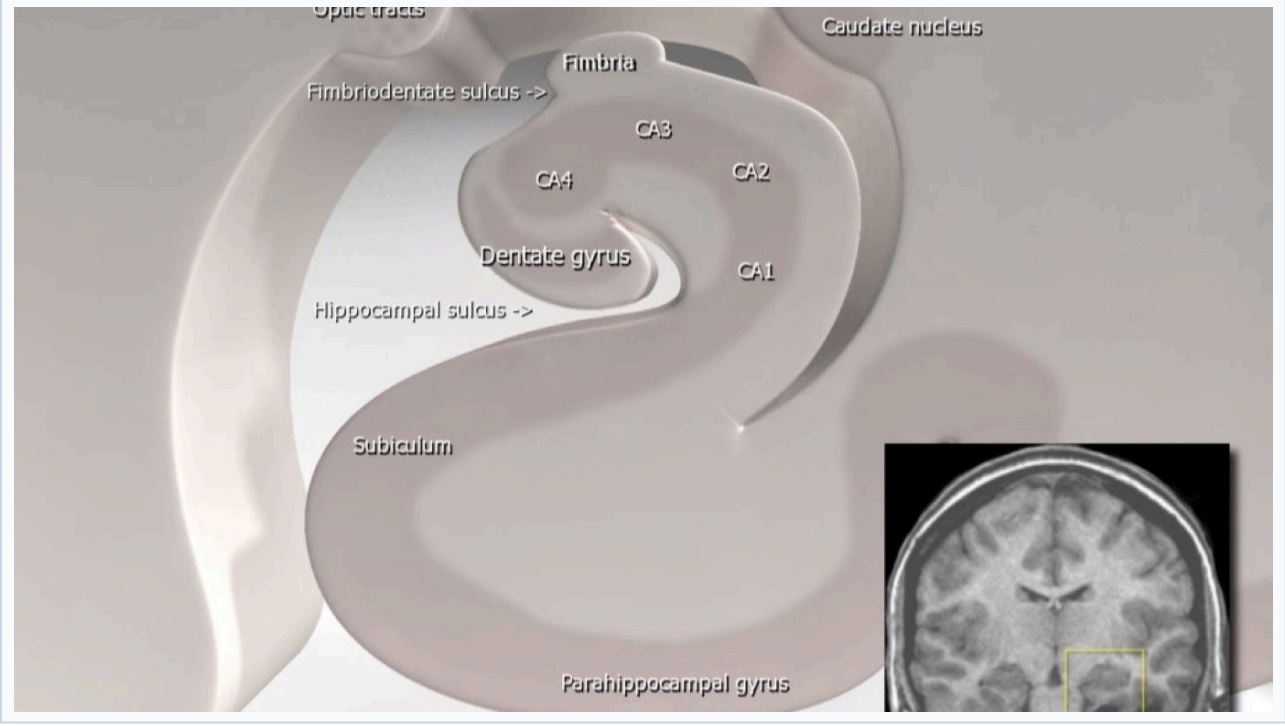
Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • অষ্টম খণ্ড

স্মৃতির মহাযন্ত্র — পেশেন্ট এইচ.এম., ব্রেন্ডা মিলনার এবং হিপোক্যাম্পাস

স্মৃতির মহাযন্ত্র — পেশেন্ট এইচ.এম., ব্রেন্ডা মিলনার এবং হিপোক্যাম্পাস

577 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ৮: *মানব মস্তিষ্কের হিপোক্যাম্পাস: নতুন তথ্য ও দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতি গঠনের প্রধান ইঞ্জিন।*

স্মৃতি ছাড়া চেতনার অস্তিত্ব কী? যে মানুষটি কেবল মাত্র তিরিশ সেকেন্ডের এক চিরন্তন বর্তমানে বন্দী—তার কি কোনো ব্যক্তিত্ব, আত্মপরিচয় বা ভবিষ্যৎ থাকতে পারে? ১৯৫৩ সালের ১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার কানেটিকাটে হেনরি গুস্তাভ মলাইসন (Henry Molaison) নামক সাতাশ বছর বয়সী এক তরুণ তীব্র মৃগীরোগের হাত থেকে বাঁচতে হাসপাতালের অপারেশন টেবিলে শুয়েছিলেন। নিউরোসার্জন উইলিয়াম স্কোভিল তাঁর মস্তিষ্কের দুই পাশের মিডিয়াল টেম্পোরাল লোবের এক বিশেষ অংশ কেটে ফেলে দিলেন—যার মধ্যে ছিল সমুদ্রঘোড়ার মতো দেখতে দুটি অঙ্গ: **হিপোক্যাম্পাস (Hippocampus)**। অস্ত্রোপচারে রোগ সারল ঠিকই, কিন্তু জন্ম নিল স্নায়ুবিজ্ঞানের ইতিহাসের সবচেয়ে বিখ্যাত চরিত্র: **পেশেন্ট এইচ.এম. (Patient H.M.)**।

অনন্ত বর্তমানের খাঁচায় বন্দী জীবন

অস্ত্রোপচারের পর জেগে উঠে দেখা গেল হেনরির বুদ্ধি, কথা বলার ক্ষমতা, শব্দভাণ্ডার এবং ব্যক্তিত্ব বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। তিনি শৈশবের কথা, বাবা-মায়ের কথা এবং ১৯৫৩ সালের আগের সমস্ত ঘটনা পরিষ্কার মনে করতে পারতেন। কিন্তু তিনি হারিয়ে ফেললেন নতুন কোনো স্মৃতি ধারণ করার ক্ষমতা—বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে **অ্যান্টেরোগ্রেড অ্যামনেশিয়া (Anterograde**

Amnesia)।

প্রতিদিন তাঁর সাথে দেখা করা চিকিৎসকও তাঁর কাছে ছিলেন আজীবনের অচেনা এক মানুষ। যে খাবারটি মাত্র দশ মিনিট আগে খেয়েছেন তা ভুলে গিয়ে তিনি বারবার খাবারের খোঁজ করতেন। একই ম্যাগাজিন শতবার পড়েও তিনি প্রতিবার নতুন আনন্দ পেতেন। এইচ.এম. কানাডিয়ান মনোবিজ্ঞানী ব্রেন্ডা মিলনারকে তাঁর মনের অনুভূতির কথা বলতে গিয়ে একবার বলেছিলেন:

> *"এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে, আমি কি কোনো ভুল কথা বলে ফেললাম? দেখুন, এই বর্তমান মুহূর্তটিতে আমার কাছে সবকিছু পরিষ্কার; কিন্তু একটু আগে কী ঘটেছিল? সেই চিন্তাই আমাকে কষ্ট দেয়। এটি যেন ঘুম থেকে জাগার অনুভূতি—আমি কিছুই মনে করতে পারছি না।" — হেনরি মলাইসন (পেশেন্ট এইচ.এম.)*

ব্রেন্ডা মিলনার ও আয়নায় আঁকার অবিস্মরণীয় পরীক্ষা

মন্ট্রিয়ল নিউরোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের তরুণ গবেষক ব্রেন্ডা মিলনার চার দশক ধরে হেনরির ওপর নিরলস গবেষণা করলেন। ১৯৬২ সালে তিনি এক অনন্য পরীক্ষা নকশা করলেন: একটি তারকার দ্বি-রেখার খাঁজের ভেতর দিয়ে পেন্সিল দিয়ে দাগ টানতে হবে—সরাসরি না তাকিয়ে কেবল আয়নায় নিজের হাত ও কাগজের উল্টো প্রতিবিম্ব দেখে!

যেকোনো স্বাভাবিক মানুষের জন্য এটি অত্যন্ত কঠিন কাজ, কারণ উল্টো প্রতিবিম্বের কারণে হাত ভুল দিকে চলে যায়। টানা তিন দিন ধরে হেনরিকে প্রতিদিন দশবার করে এই পরীক্ষা করানো হলো। প্রতিদিন তাঁর ভুলের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে কমে শূন্যে নেমে এলো—স্বাভাবিক মানুষের মতো তিনি নিখুঁতভাবে কাজটি শিখে ফেললেন!

কিন্তু তৃতীয় দিন যখন তিনি সম্পূর্ণ ত্রুটিহীনভাবে তারাটি এঁকে ফেললেন, তখন তিনি মিলনারের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বললেন: *"আরে কী অদ্ভুত! আমি ভেবেছিলাম কাজটি খুব কঠিন হবে, কিন্তু দেখছি আমি তো বেশ ভালোই করলাম। অথচ আমার জীবনে আমি এই যন্ত্রটি কখনো চোখেই দেখিনি!"*

মানব স্মৃতির বহুস্তরীয় বিন্যাস

মিলনারের এই আবিষ্কার প্রমাণ করল স্মৃতি কোনো একক ভাণ্ডার নয়; এটি মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন শারীরিক অঞ্চলে সংরক্ষিত হয়:

1. **ঘোষণামূলক বা ডিক্লেয়ারেটিভ স্মৃতি (হিপোক্যাম্পাস নির্ভর):**
    - **এপিসোডিক মেমরি:** ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা ও স্মৃতিকথা ("আজ সকালে কী খেয়েছি")।
    - **সিম্যান্টিক মেমরি:** জ্ঞান ও তথ্যের ভাণ্ডার ("প্যারিস ফ্রান্সের রাজধানী")।

    এই স্মৃতিগুলো গঠনের জন্য হিপোক্যাম্পাস অপরিহার্য।
2. **অঘোষণামূলক বা প্রসিডিউরাল স্মৃতি (হিপোক্যাম্পাস মুক্ত):**
    - **কৌশলগত স্মৃতি:** সাইকেল চালানো, পিয়ানো বাজানো বা আয়নায় আঁকার মতো শারীরিক দক্ষতা—যা সংরক্ষিত হয় **সেরেবেলাম** এবং **ব্যাসাল গ্যাংলিয়ায়**।
    - **আবেগীয় স্মৃতি:** ভয় বা অনুভূতির স্মৃতি—যা সংরক্ষিত হয় **অ্যামিগডালায়**।

Shakil Mahmud • Research Monograph

সিস্টেমস কনসোলিডেশন: হিপোক্যাম্পাস থেকে কর্টেক্স

হিপোক্যাম্পাস না থাকা সত্ত্বেও হেনরি শৈশবের কথা মনে রাখতে পারতেন কেন? কারণ হিপোক্যাম্পাস স্মৃতির স্থায়ী গুদামঘর নয়; এটি একটি অস্থায়ী বুকমার্ক বা লাইব্রেরির ক্যাটালগ কার্ড। বিশেষ করে গভীর ঘুমের সময় হিপোক্যাম্পাস নতুন স্মৃতিগুলোকে বারবার প্লে করে ধীরে ধীরে কর্টেক্সের দীর্ঘস্থায়ী নেটওয়ার্কে পাঠিয়ে দেয়—যাকে বলে **স্মৃতি সংহতকরণ (Memory Consolidation)**।

২০০৮ সালের ২ ডিসেম্বর বিরাশি বছর বয়সে হেনরি মলাইসন মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মস্তিষ্কটি সযত্নে হিমায়িত করে ২৪০১টি পাতলা স্লাইসে কেটে বিশ্বজুড়ে চার লক্ষ বিজ্ঞানীর সামনে লাইভ সম্প্রচার করা হয়। এইচ.এম. মানবজাতিকে শিখিয়ে গেছেন: আমাদের অতীত স্মৃতি আর ভবিষ্যতের স্বপ্নের মাঝের সংযোগকারী সেতুটি হলো হিপোক্যাম্পাস—যা আমাদের ভাসমান সচেতন মুহূর্তগুলোকে রূপ দেয় জীবনের এক অবিস্মরণীয় মহাকাব্যে।

❦

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "স্মৃতির মহাযন্ত্র — পেশেন্ট এইচ.এম., ব্রেন্ডা মিলনার এবং হিপোক্যাম্পাস"। চেতনার মহাবিকাশ, খণ্ড ৮।
https://shakilmahmud.com/bn/story-of-consciousness-part-08-engine-of-memory-patient-hm-hippocampus-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • নবম খণ্ড

পরিবর্তনশীল মস্তিষ্ক — নিউরোপ্লাস্টিসিটি, নিউরোজেনেসিস এবং এরিক ক্যান্ডেলের সি-স্লাগ

পরিবর্তনশীল মস্তিষ্ক — নিউরোপ্লাস্টিসিটি, নিউরোজেনেসিস এবং এরিক ক্যান্ডেলের সি-স্লাগ

515 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ৯: *অ্যাপ্লিসিয়া ক্যালিফোর্নিকা: ক্যালিফোর্নিয়ার সামুদ্রিক সি-স্লাগ, যার মাধ্যমে এরিক ক্যান্ডেল সাইন্যাপ্টিক প্লাস্টিসিটি উন্মোচন করেন।*

প্রায় এক শতাব্দী ধরে স্নায়ুবিজ্ঞানের অবিচল অনুশাসন ছিল: প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মস্তিষ্ক একবার তৈরি হয়ে গেলে তা পাথরের মতো অনমনীয় এবং চিরতরে অপরিবর্তনশীল। ১৯২৮ সালে সান্তিয়াগো রামোন ই কাহাল লিখেছিলেন: *“প্রাপ্তবয়স্কদের মস্তিষ্কে স্নায়ুপথগুলো স্থায়ী, সমাপ্ত এবং অপরিবর্তনশীল। সবকিছু মারা যেতে পারে, কিন্তু নতুন কিছু পুনর্জন্ম নিতে পারে না।”* মস্তিষ্ককে ভাবা হতো এমন এক টেলিফোন এক্সচেঞ্জ যার তার শৈশবে একবার পাতা হয়ে গেলে জীবনে আর কখনো নতুন করে জোড়া লাগানো যায় না। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অস্ট্রিয়ান-আমেরিকান বিজ্ঞানী এরিক ক্যান্ডেল এক সামুদ্রিক শামুকের ওপর গবেষণা চালিয়ে এই স্থির মতবাদ গুঁড়িয়ে দিয়ে উন্মোচন করলেন চেতনার সবচেয়ে আশাজাগানিয়া সত্য: **নিউরোপ্লাস্টিসিটি (Neuroplasticity)**।

হেবের নীতি: যে নিউরনরা একসাথে জ্বলে, তারা একসাথে জোড়া বাঁধে

১৯৪৯ সালে কানাডিয়ান মনোবিজ্ঞানী ডোনাল্ড হেব তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে শেখার এক মৌলিক তাত্ত্বিক মেকানিজম প্রস্তাব করলেন। হেব বললেন, যখন নিউরন ‘ক’ বারবার নিউরন ‘খ’-কে উদ্দীপিত করে, তখন তাদের সংযোগস্থলে এমন কিছু শারীরিক পরিবর্তন ঘটে যাতে পরবর্তীতে ‘ক’ নিউরনটি অতি সহজে ‘খ’-কে জাগিয়ে তুলতে পারে:

Shakil Mahmud • Research Monograph

> *“যে নিউরনগুলো একসাথে জ্বলে ওঠে, তাদের মধ্যে স্থায়ী বন্ধন রচিত হয় (Cells that fire together, wire together)।” — হেবের নীতি*

১৯৭৩ সালে ওসলোর ল্যাবরেটরিতে টেরিয়ে লোমো খরগোশের হিপোক্যাম্পাসে উচ্চ কম্পাঙ্কের বিদ্যুৎ সংকেত পাঠিয়ে প্রমাণ করলেন যে সাইন্যাপসের কার্যক্ষমতা কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত স্থায়ীভাবে বেড়ে যায়—যাকে বলে **লং-টার্ম পোটেনশিয়েশন (LTP)**।

অ্যাপ্লিসিয়া ক্যালিফোর্নিকা: বিশালাকার সি-স্লাগের বিপ্লব

যখন অধিকাংশ বিজ্ঞানী কোটি কোটি নিউরনের জটিল স্তন্যপায়ীর মস্তিষ্কে স্মৃতির খোঁজ করছিলেন, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ গবেষক এরিক ক্যান্ডেল এক সাহসী সিদ্ধান্ত নিলেন: তিনি বেছে নিলেন ক্যালিফোর্নিয়ার সমুদ্রের বিশালাকার শামুক **অ্যাপ্লিসিয়া ক্যালিফোর্নিকা (Aplysia californica)**।

মানুষের মস্তিষ্কে যেখানে ৮৬০০ কোটি নিউরন রয়েছে, অ্যাপ্লিসিয়ার শরীরে রয়েছে মাত্র **২০,০০০ নিউরন**! আর এর স্নায়ুকোষগুলো মানুষের চেয়ে শত গুণ বড়—প্রায় ১ মিলিমিটার পর্যন্ত চওড়া, যা মাইক্রোস্কোপে সহজেই শনাক্ত করা যায় এবং প্রতিটির ভেতরে আলাদা করে ইলেকট্রোড প্রবেশ করানো সম্ভব।

স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতির আণবিক রূপান্তর

ক্যান্ডেল অ্যাপ্লিসিয়ার শ্বাস ফুলকা সঙ্কোচন রিফ্লেক্স পরীক্ষা করলেন:

- **অভ্যস্ততা (Habituation):** শামুকের গায়ে বারবার আলতো পানির ধারা দিলে সে বুঝতে পারে এতে কোনো বিপদ নেই; ধীরে ধীরে ফুলকা সঙ্কোচনের মাত্রা কমে যায়। দেখা গেল সাইন্যাপসে ক্যালসিয়াম চ্যানেল নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়ে গ্লুটামেট নির্গমন বন্ধ করে দিয়েছে।
- **সংবেদনশীলতা (Sensitization):** কিন্তু আলতো ছোঁয়ার সাথে লেজে মৃদু বৈদ্যুতিক শক দিলে শামুকটি সতর্ক হয়ে ওঠে। সেরোটোনিন হরমোন ক্ষরিত হয়ে সাইক্লিক এএমপি (cAMP) তৈরি করে পটাসিয়াম চ্যানেল বন্ধ করে দেয়—যার ফলে অ্যাকশন পটেনশিয়াল দীর্ঘায়িত হয়ে প্রচুর ক্যালসিয়াম ঢোকায় এবং বিপুল রাসায়নিক ছড়িয়ে পড়ে।
- **শারীরিক পুনর্গঠন (দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতি):** বারবার প্রশিক্ষণ দিলে প্রোটিন কাইনেজ এনজাইম কোষের নিউক্লিয়াসে প্রবেশ করে **CREB** নামক জিন সক্রিয় করে। এই জিন নতুন প্রোটিন তৈরি করে আক্ষরিক অর্থেই নিউরনের ডেনড্রাইটে নতুন নতুন শাখা ও সাইন্যাপ্টিক বোতাম গজিয়ে তোলে!

স্বল্পমেয়াদী স্মৃতি হলো বিদ্যমান প্রোটিনের রাসায়নিক পরিবর্তন; আর দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতি মানে হলো মস্তিষ্কে শারীরিকভাবে নতুন নতুন স্নায়ু তারের জন্ম নেওয়া!

প্রাপ্তবয়স্ক নিউরোজেনেসিস: মস্তিষ্কে নতুন কোষের জন্ম

১৯৯০-এর দশকের শেষের দিকে এলিজাবেথ গোল্ড এবং ফ্রেড গেজ কাহালের শতাব্দী প্রাচীন শেষ নিষেধটিও বাতিল করলেন। তাঁরা প্রমাণ করলেন যে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের হিপোক্যাম্পাসেও আজীবন প্রতিদিন শত শত নতুন নিউরন কোষ জন্ম নেয়—**অ্যাডাল্ট নিউরোজেনেসিস (Adult Neurogenesis)**।

২০০০ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত ক্যান্ডেলের এই গবেষণা প্রমাণ করল যে আমাদের চেতনা কোনো পাথরে খোদাই করা অনড় স্মৃতিসৌধ নয়; এটি এক চিরপ্রবাহী নদী। আমরা যা পড়ি, যা শিখি আর যা অনুভব করি—প্রতিটি অভিজ্ঞতা আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়বিক মানচিত্রকে শারীরিকভাবে নতুন করে রূপ দান করে।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "পরিবর্তনশীল মস্তিষ্ক — নিউরোপ্লাস্টিসিটি, নিউরোজেনেসিস এবং এরিক ক্যান্ডেলের সি-স্লাগ"। চেতনার মহাবিকাশ, খণ্ড ৯। https://shakilmahmud.com/bn/story-of-consciousness-part-09-plastic-brain-kandel-synaptic-plasticity-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • দশম খণ্ড

পূর্বাভাসমূলক মস্তিষ্ক — কার্ল ফ্রিস্টন, ফ্রি এনার্জি নীতি এবং হেলমহোল্টজের অবচেতন অনুমান

পূর্বাভাসমূলক মস্তিষ্ক — কার্ল ফ্রিস্টন, ফ্রি এনার্জি নীতি এবং হেলমহোল্টজের অবচেতন অনুমান

457 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ১০: *হেরমান ফন হেলমহোল্টজ: অবচেতন অনুমানের প্রবক্তা, যা বর্তমান প্রেডিক্টিভ কোডিং ও বেয়িজিয়ান মস্তিষ্কের ভিত্তি।*

আমাদের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান বলে যে আমাদের চোখ দুটি যেন ভিডিও ক্যামেরা—বাইরের বাস্তব জগত থেকে আলো এসে রেটিনায় পড়ে এবং সেই সংকেত অপটিক স্নায়ু বেয়ে মস্তিষ্কের পর্দায় বাইরের জগতের হুবহু প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলে। আধুনিক কম্পিউটেশনাল স্নায়ুবিজ্ঞান দেখিয়েছে যে এই ধারণাটি সম্পূর্ণ একটি উল্টো বিভ্রান্তি! আমাদের মস্তিষ্ক কখনোই বাইরের তথ্যের জন্য নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকে না; বরং এটি মাথার ভেতরে তৈরি হওয়া মডেল থেকে সার্বক্ষণিক নিচের দিকে অনুমানের ছবি ছুড়ে দেয়, আর চোখ থেকে আসা সংকেত কেবল সেই অনুমানের ভুলত্রুটি সংশোধন করে। যেমনটি স্নায়ুবিজ্ঞানী অনিল শেঠ বলেছেন: *“আমাদের প্রত্যক্ষ বাস্তবতা হলো আসলে একটি নিয়ন্ত্রিত হ্যালুসিনেশন।”*

হেলমহোল্টজ ও অবচেতন অনুমান (Unconscious Inference)

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জার্মান বহুবিদ্যাবিশারদ হেরমান ফন হেলমহোল্টজ দৃষ্টিবিজ্ঞানের এক মৌলিক সংকট তুলে ধরেন: রেটিনার দ্বিমাত্রিক বক্রতলে আলো পড়ার কোটি কোটি দৃশ্যপট তৈরি হতে পারে।

তাহলে মস্তিষ্ক কীভাবে প্রতিটি মুহূর্তের তাৎক্ষণিক অর্থ বের করে? হেলমহোল্টজ প্রস্তাব করলেন **অবচেতন অনুমান**: মস্তিষ্ক পূর্ব অভিজ্ঞতা ও সম্ভাবনার সূত্র ব্যবহার করে মুহূর্তের মধ্যে সবচেয়ে সম্ভাব্য ভৌত দৃশ্যপটটি কল্পনা করে নেয় এবং সেই অনুমানটিকেই আমাদের সামনে নিখুঁত বাস্তবতা হিসেবে উপহার দেয়।

হায়ারারকিক্যাল প্রেডিক্টিভ কোডিং

১৯৯৯ সালে রাজেশ রাও এবং ডানা ব্যালার্ড হেলমহোল্টজের এই ভাবনাকে আধুনিক গাণিতিক রূপ দিলেন: **প্রেডিক্টিভ কোডিং (Predictive Coding)**।

মস্তিষ্কের কর্টেক্স সাজানো রয়েছে একাধিক স্তরে। উচ্চতর স্তরগুলো জগত সম্পর্কে পূর্বাভাস বা প্রাক-ধারণা (mu) তৈরি করে নিচের দিকে পাঠায়। আর নিচের সংবেদনশীল স্তরগুলো বাইরের সংকেতের (y) সাথে এই অনুমানের তুলনা করে বের করে বিচ্যুতি বা **পূর্বাভাস ত্রুটি (Prediction Error)**:

$$\text{Prediction Error} = \text{বাস্তব সংকেত} \&\#8211; \text{পূর্বাভাস}$$

আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, চোখ থেকে আসা কাঁচা তথ্য মস্তিষ্কের ওপরের স্তরে যায় না! কেবল এই 'ভুলের সংকেতটুকু' ওপরের দিকে ওঠে, যার ভিত্তিতে মস্তিষ্ক নিজের ভেতরের ধারণাকে বদলে ফেলে। শারীরবৃত্তীয়ভাবে মানুষের দৃষ্টি কর্টেক্সে ওপর থেকে নিচে নামা স্নায়ুর সংখ্যা নিচ থেকে ওপরে ওঠা স্নায়ুর চেয়ে প্রায় দশ গুণ বেশি!

কার্ল ফ্রিস্টন ও ফ্রি এনার্জি নীতি

লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজের স্নায়ুতাত্ত্বিক কার্ল ফ্রিস্টন এই ধারণাকে জীববিজ্ঞানের সার্বজনীন তত্ত্বে রূপ দিলেন—**ফ্রি এনার্জি নীতি (Free Energy Principle)**।

থার্মোডায়নামিক্সের বিশৃঙ্খলা এড়াতে যেকোনো জীবন্ত মস্তিষ্ককে তথ্যের বিস্ময় বা ত্রুটি কমাতে হয়। এই ভ্যারিয়েশনাল ফ্রি এনার্জি (F) কমাতে মস্তিষ্কের হাতে মাত্র দুটি পথ খোলা থাকে:

1. **অনুমানের পরিবর্তন (Perceptual Inference):** বাইরের বাস্তবতার সাথে মেলাতে গিয়ে নিজের ভেতরের বিশ্বাস বা মতামত বদলে ফেলা (মন পরিবর্তন)।
2. **সক্রিয় হস্তক্ষেপ (Active Inference):** নিজের প্রত্যাশা অনুযায়ী বাইরের পরিবেশকে শারীরিক কাজের মাধ্যমে বদলে ফেলা (বাস্তবতা পরিবর্তন)।

চেতনা: নিয়ন্ত্রিত হ্যালুসিনেশন

প্রেডিক্টিভ ব্রেন তত্ত্ব চেতনার অর্থকে চিরতরে বদলে দিয়েছে। আমরা এই মুহূর্তে যা দেখছি—গোলাপের লাল রঙ, সুরের মূর্ছনা বা প্রিয়জনের মুখ—তা বাইরের কোনো পরম বস্তু নয়; তা হলো আমাদের মস্তিষ্কের ভেতরে তৈরি হওয়া সেরা বৈজ্ঞানিক হাইপোথিসিস বা স্বপ্ন, যা বাইরের ইন্দ্রিয়ের ভুলত্রুটির নিয়মে সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রিত।

যখন ইন্দ্রিয়ের এই ভুল সংশোধনের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়, তখনই জন্ম নেয় মানসিক রোগ: সিজোফ্রেনিয়ায় মস্তিষ্কের নিজস্ব অবাস্তব পূর্বাভাস বাইরের সংকেতকে অগ্রাহ্য করে উন্মাদনা তৈরি করে। আমাদের জাগ্রত সচেতন জীবন হলো এক অপূর্ব ভারসাম্য—যেখানে মস্তিষ্কের ভেতরের স্বপ্ন বাইরের পৃথিবীর সাথে এক নিখুঁত মেলবন্ধনে আবদ্ধ থাকে।

Shakil Mahmud • Research Monograph



সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "পূর্বাভাসমূলক মস্তিষ্ক — কার্ল ফ্রিস্টন, ফ্রি এনার্জি নীতি এবং হেলমহোল্টজের অবচেতন অনুমান"। চেতনার মহাবিকাশ, খণ্ড ১০। https://shakilmahmud.com/bn/story-of-consciousness-part-10-predictive-engine-friston-free-energy-helmholtz-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • একাদশ খণ্ড

চেতনার কঠিন সমস্যা — ডেভিড চালমার্স, থমাস নাগেল এবং কোয়ালিয়ার রহস্য

চেতনার কঠিন সমস্যা — ডেভিড চালমার্স, থমাস নাগেল এবং কোয়ালিয়ার রহস্য

2,546 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ১১: *ডেভিড চালমার্স: চেতনার 'কঠিন সমস্যা' (Hard Problem) এবং কোয়ালিয়ার অনুভূতির সংজ্ঞায়নকারী দার্শনিক।*

- **"সহজ" সমস্যাগুলো:** এগুলো হলো মস্তিষ্কের তথ্য প্রক্রিয়াকরণের যান্ত্রিক প্রশ্ন: কীভাবে চোখ আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য আলাদা করে, কীভাবে কান শব্দ শোনে, কীভাবে স্নায়ু সংকেত মেমরিতে জমা থাকে এবং কীভাবে মুখ দিয়ে কথা বলা যায়। এগুলো শারীরবৃত্তীয়ভাবে অত্যন্ত জটিল হলেও এদের সমাধান করতে বিজ্ঞানের কোনো নতুন দর্শনের প্রয়োজন নেই; সময় ও গবেষণার কল্যাণে জীববিজ্ঞান এগুলোর ব্যাখ্যা দিয়ে দেবে।
- **"কঠিন" সমস্যাটি:** কিন্তু এই সমস্ত জৈব-রাসায়নিক হিসাব-নিকাশের সাথে একটি প্রথম-পুরুষের ভেতরের আত্মোপলব্ধি কেন যুক্ত হতে হবে? একটি সাধারণ রোবট তো আলো দেখে সরে যেতে পারে, তাপ লাগলে হাত সরাতে পারে—পুরোপুরি অন্ধ অচেতন কোনো কম্পিউটারের মতো। তবে আমাদের ক্ষেত্রে এই শারীরিক প্রক্রিয়ার সাথে সাথে *ব্যক্তিগত অনুভূতির স্বাদ* কেন জন্ম নেয়? বেঁচে থাকার অনুভূতি কেন অনুভব করতে হয়?

কোয়ালিয়া (Qualia): অনুভূতির নিজস্ব রূপ

দার্শনিকরা আমাদের মনের ভেতরের এই আত্মগত, সরাসরি ব্যক্তিগত অনুভূতির নাম দিয়েছেন **কোয়ালিয়া (Qualia)**:

Shakil Mahmud • Research Monograph

- লাল গোলাপের গাঢ় লাল রঙের তীব্র অনুভূতি।
- আগুনে হাত পুড়লে অসহ্য যন্ত্রণার নিজস্ব স্বাদ।
- বৃষ্টির ভেজা মাটির মন কেমন করা ঘ্রাণ।
- বিষাদের কোনো সুর শুনে বুকের ভেতর হাহাকার করে ওঠা।

পদার্থবিজ্ঞান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৭০০ ন্যানোমিটার হিসেবে মাপতে পারে; স্নায়ুবিজ্ঞান রেটিনা ও কর্টেক্সের ভি৪ এরিয়ার নিউরন ফায়ারিং মাপতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত বস্তুগত বিবরণের কোথাও লাল রঙ *চোখে দেখার নিজস্ব অনুভূতির স্বাদ* ব্যাখ্যা করা যায় না!

থমাস নাগেল: বাদুড় হওয়ার অনুভূতি কেমন?

চালমার্সের কুড়ি বছর আগে, ১৯৭৪ সালে আমেরিকান দার্শনিক থমাস নাগেল এক বিখ্যাত প্রবন্ধ লিখলেন: *“একটি বাদুড় হওয়া কেমন অনুভূতি?” (What Is It Like to Be a Bat?)*

বাদুড় রাতে ওড়ার সময় অতিস্বনক শব্দ তরঙ্গ ছুড়ে দিয়ে তার প্রতিধ্বনি শুনে জগতকে অনুভব করে (ইকোলোকেশন)। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা একটি বাদুড়ের মস্তিষ্কের শেষ আয়ন চ্যানেল পর্যন্ত ব্যবচ্ছেদ করতে পারি। কিন্তু নাগেল বললেন, বাদুড়ের সমস্ত শারীরস্থান মুখস্থ করার পরও কোনো মানুষ কখনো জানতে পারবে না *একটি বাদুড় হিসেবে ভেতর থেকে ওই প্রতিধ্বনি শোনার অনুভূতিটি আসলে কেমন!* বিজ্ঞান যখনই ব্যক্তিসত্তাকে বাদ দিয়ে শুধুই বস্তুগত মাপে নামে, তখন সে চেতনার আসল প্রাণভোমরাটিকেই হারিয়ে ফেলে।

রঙ বিজ্ঞানী মেরি ও ফিলোসফিক্যাল জম্বি

এই শূন্যতাকে প্রমাণ করতে দার্শনিকরা দুটি অমর কাল্পনিক পরীক্ষা হাজির করলেন:

1. **রঙ বিজ্ঞানী মেরি (Frank Jackson, 1982):** মেরি হলেন এক অতি প্রতিভাবান বিজ্ঞানী যিনি জন্ম থেকে একটি সম্পূর্ণ সাদা-কালো ঘরে বড় হয়েছেন। তিনি পদার্থবিজ্ঞান ও স্নায়ুবিজ্ঞানের সমস্ত বই পড়ে রঙের সমস্ত তত্ত্ব মুখস্থ করেছেন—তরঙ্গদৈর্ঘ্য, অপটিক স্নায়ু, মস্তিষ্কের কোড। একদিন যখন তাঁকে সাদা-কালো ঘর থেকে মুক্ত করা হলো এবং তিনি একটি তাজা লাল আপেল দেখলেন—তিনি কি নতুন কিছু শিখলেন? উত্তর হলো হ্যাঁ: তিনি শিখলেন *লাল রঙ দেখার অনুভূতিটি বাস্তবে কেমন লাগে*! সুতরাং কেবল বস্তুগত তথ্যের ভেতরেই পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান সীমাবদ্ধ নয়।
2. **ফিলোসফিক্যাল জম্বি (P-Zombie):** কল্পনা করুন আপনার অবিকল একটি পারমাণবিক শারীরিক ক্লোন। সে আপনার মতো হাসে, কাঁদে, কথা বলে এবং তাপ লাগলে উফ করে ওঠে; তার নিউরনগুলো অবিকল আপনার মতো ফায়ার করে। কিন্তু তার ভেতরে কোনো মন বা অনুভূতি নেই—সবকিছু শুধুই নিরেট অন্ধ অন্ধকার! যদি এমন কোনো জম্বির অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব হয়, তবে মেনে নিতে হবে যে কেবল ভৌত কণা দিয়েই চেতনার ব্যাখ্যা সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

চেতনার কঠিন সমস্যা হলো আধুনিক বিজ্ঞানের সেই সীমান্ত যেখানে নিউরোসায়েন্স মিশে যায় দর্শনের অসীমে। চেতনা কি মহাবিশ্বের আরেকটি মৌলিক উপাদান—যেমন ভর বা চার্জ (প্যানসাইকিজম)? নাকি ভবিষ্যতে কোনো নতুন বিজ্ঞান এই ব্যাখ্যার সেতুবন্ধন রচনা করবে? এই উত্তর সন্ধানের রোমাঞ্চেই লুকিয়ে রয়েছে মানব বুদ্ধিমত্তার সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

- লাল গোলাপের গাঢ় লাল রঙের তীব্র অনুভূতি।
- আগুনে হাত পুড়লে অসহ্য যন্ত্রণার নিজস্ব স্বাদ।
- বৃষ্টির ভেজা মাটির মন কেমন করা ঘ্রাণ।
- বিষাদের কোনো সুর শুনে বুকের ভেতর হাহাকার করে ওঠা।

পদার্থবিজ্ঞান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৭০০ ন্যানোমিটার হিসেবে মাপতে পারে; স্নায়ুবিজ্ঞান রেটিনা ও কর্টেক্সের ভি৪ এরিয়ার নিউরন ফায়ারিং মাপতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত বস্তুগত বিবরণের কোথাও লাল রঙ *চোখে দেখার নিজস্ব অনুভূতির স্বাদ* ব্যাখ্যা করা যায় না!

থমাস নাগেল: বাদুড় হওয়ার অনুভূতি কেমন?

চালমার্সের কুড়ি বছর আগে, ১৯৭৪ সালে আমেরিকান দার্শনিক থমাস নাগেল এক বিখ্যাত প্রবন্ধ লিখলেন: *"একটি বাদুড় হওয়া কেমন অনুভূতি?" (What Is It Like to Be a Bat?)*

বাদুড় রাতে ওড়ার সময় অতিস্বনক শব্দ তরঙ্গ ছুড়ে দিয়ে তার প্রতিধ্বনি শুনে জগতকে অনুভব করে (ইকোলোকেশন)। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা একটি বাদুড়ের মস্তিষ্কের শেষ আয়ন চ্যানেল পর্যন্ত ব্যবচ্ছেদ করতে পারি। কিন্তু নাগেল বললেন, বাদুড়ের সমস্ত শারীরস্থান মুখস্থ করার পরও কোনো মানুষ কখনো জানতে পারবে না *একটি বাদুড় হিসেবে ভেতর থেকে ওই প্রতিধ্বনি শোনার অনুভূতিটি আসলে কেমন!* বিজ্ঞান যখনই ব্যক্তিসত্তাকে বাদ দিয়ে শুধুই বস্তুগত মাপে নামে, তখন সে চেতনার আসল প্রাণভোমরাটিকেই হারিয়ে ফেলে।

রঙ বিজ্ঞানী মেরি ও ফিলোসফিক্যাল জম্বি

এই শূন্যতাকে প্রমাণ করতে দার্শনিকরা দুটি অমর কাল্পনিক পরীক্ষা হাজির করলেন:

1. **রঙ বিজ্ঞানী মেরি (Frank Jackson, 1982):** মেরি হলেন এক অতি প্রতিভাবান বিজ্ঞানী যিনি জন্ম থেকে একটি সম্পূর্ণ সাদা-কালো ঘরে বড় হয়েছেন। তিনি পদার্থবিজ্ঞান ও স্নায়ুবিজ্ঞানের সমস্ত বই পড়ে রঙের সমস্ত তত্ত্ব মুখস্থ করেছেন—তরঙ্গদৈর্ঘ্য, অপটিক স্নায়ু, মস্তিষ্কের কোড। একদিন যখন তাঁকে সাদা-কালো ঘর থেকে মুক্ত করা হলো এবং তিনি একটি তাজা লাল আপেল দেখলেন—তিনি কি নতুন কিছু শিখলেন? উত্তর হলো হ্যাঁ: তিনি শিখলেন *লাল রঙ দেখার অনুভূতিটি বাস্তবে কেমন লাগে*! সুতরাং কেবল বস্তুগত তথ্যের ভেতরেই পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান সীমাবদ্ধ নয়।
2. **ফিলোসফিক্যাল জম্বি (P-Zombie):** কল্পনা করুন আপনার অবিকল একটি পারমাণবিক শারীরিক ক্লোন। সে আপনার মতো হাসে, কাঁদে, কথা বলে এবং তাপ লাগলে উফ করে ওঠে; তার নিউরনগুলো অবিকল আপনার মতো ফায়ার করে। কিন্তু তার ভেতরে কোনো মন বা অনুভূতি নেই—সবকিছু শুধুই নিরেট অন্ধ অন্ধকার! যদি এমন কোনো জম্বির অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব হয়, তবে মেনে নিতে হবে যে কেবল ভৌত কণা দিয়েই চেতনার ব্যাখ্যা সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

চেতনার কঠিন সমস্যা হলো আধুনিক বিজ্ঞানের সেই সীমান্ত যেখানে নিউরোসায়েন্স মিশে যায় দর্শনের অসীমে। চেতনা কি মহাবিশ্বের আরেকটি মৌলিক উপাদান—যেমন ভর বা চার্জ (প্যানসাইকিজম)? নাকি ভবিষ্যতে কোনো নতুন বিজ্ঞান এই ব্যাখ্যার সেতুবন্ধন রচনা করবে? এই উত্তর সন্ধানের রোমাঞ্চেই লুকিয়ে রয়েছে মানব বুদ্ধিমত্তার সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

- **"সহজ" সমস্যাগুলো:** এগুলো হলো মস্তিষ্কের তথ্য প্রক্রিয়াকরণের যান্ত্রিক প্রশ্ন: কীভাবে চোখ আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য আলাদা করে, কীভাবে কান শব্দ শোনে, কীভাবে স্নায়ু সংকেত মেমরিতে জমা থাকে এবং কীভাবে মুখ দিয়ে কথা বলা যায়। এগুলো শারীরবৃত্তীয়ভাবে অত্যন্ত জটিল হলেও এদের সমাধান করতে বিজ্ঞানের কোনো নতুন দর্শনের প্রয়োজন নেই; সময় ও গবেষণার কল্যাণে জীববিজ্ঞান এগুলোর ব্যাখ্যা দিয়ে দেবে।
- **"কঠিন" সমস্যাটি:** কিন্তু এই সমস্ত জৈব-রাসায়নিক হিসাব-নিকাশের সাথে একটি প্রথম-পুরুষের ভেতরের আত্মোপলব্ধি কেন যুক্ত হতে হবে? একটি সাধারণ রোবট তো আলো দেখে সরে যেতে পারে, তাপ লাগলে হাত সরাতে পারে—পুরোপুরি অন্ধ অচেতন কোনো কম্পিউটারের মতো। তবে আমাদের ক্ষেত্রে এই শারীরিক প্রক্রিয়ার সাথে সাথে *ব্যক্তিগত অনুভূতির স্বাদ* কেন জন্ম নেয়? বেঁচে থাকার অনুভূতি কেন অনুভব করতে হয়?

Shakil Mahmud • Research Monograph

কোয়ালিয়া (Qualia): অনুভূতির নিজস্ব রূপ

দার্শনিকরা আমাদের মনের ভেতরের এই আত্মগত, সরাসরি ব্যক্তিগত অনুভূতির নাম দিয়েছেন **কোয়ালিয়া (Qualia)**:

- লাল গোলাপের গাঢ় লাল রঙের তীব্র অনুভূতি।
- আগুনে হাত পুড়লে অসহ্য যন্ত্রণার নিজস্ব স্বাদ।
- বৃষ্টির ভেজা মাটির মন কেমন করা ঘ্রাণ।
- বিষাদের কোনো সুর শুনে বুকের ভেতর হাহাকার করে ওঠা।

পদার্থবিজ্ঞান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৭০০ ন্যানোমিটার হিসেবে মাপতে পারে; স্নায়ুবিজ্ঞান রেটিনা ও কর্টেক্সের ভি৪ এরিয়ার নিউরন ফায়ারিং মাপতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত বস্তুগত বিবরণের কোথাও লাল রঙ *চোখে দেখার নিজস্ব অনুভূতির স্বাদ* ব্যাখ্যা করা যায় না!

থমাস নাগেল: বাদুড় হওয়ার অনুভূতি কেমন?

চালমার্সের কুড়ি বছর আগে, ১৯৭৪ সালে আমেরিকান দার্শনিক থমাস নাগেল এক বিখ্যাত প্রবন্ধ লিখলেন: *“একটি বাদুড় হওয়া কেমন অনুভূতি?” (What Is It Like to Be a Bat?)*

বাদুড় রাতে ওড়ার সময় অতিস্বনক শব্দ তরঙ্গ ছুড়ে দিয়ে তার প্রতিধ্বনি শুনে জগতকে অনুভব করে (ইকোলোকেশন)। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা একটি বাদুড়ের মস্তিষ্কের শেষ আয়ন চ্যানেল পর্যন্ত ব্যবচ্ছেদ করতে পারি। কিন্তু নাগেল বললেন, বাদুড়ের সমস্ত শারীরস্থান মুখস্থ করার পরও কোনো মানুষ কখনো জানতে পারবে না *একটি বাদুড় হিসেবে ভেতর থেকে ওই প্রতিধ্বনি শোনার অনুভূতিটি আসলে কেমন!* বিজ্ঞান যখনই ব্যক্তিসত্তাকে বাদ দিয়ে শুধুই বস্তুগত মাপে নামে, তখন সে চেতনার আসল প্রাণভোমরাটিকেই হারিয়ে ফেলে।

রঙ বিজ্ঞানী মেরি ও ফিলোসফিক্যাল জম্বি

এই শূন্যতাকে প্রমাণ করতে দার্শনিকরা দুটি অমর কাল্পনিক পরীক্ষা হাজির করলেন:

1. **রঙ বিজ্ঞানী মেরি (Frank Jackson, 1982):** মেরি হলেন এক অতি প্রতিভাবান বিজ্ঞানী যিনি জন্ম থেকে একটি সম্পূর্ণ সাদা-কালো ঘরে বড় হয়েছেন। তিনি পদার্থবিজ্ঞান ও স্নায়ুবিজ্ঞানের সমস্ত বই পড়ে রঙের সমস্ত তত্ত্ব মুখস্থ করেছেন—তরঙ্গদৈর্ঘ্য, অপটিক স্নায়ু, মস্তিষ্কের কোড। একদিন যখন তাঁকে সাদা-কালো ঘর থেকে মুক্ত করা হলো এবং তিনি একটি তাজা লাল আপেল দেখলেন—তিনি কি নতুন কিছু শিখলেন? উত্তর হলো হ্যাঁ: তিনি শিখলেন *লাল রঙ দেখার অনুভূতিটি বাস্তবে কেমন লাগে*! সুতরাং কেবল বস্তুগত তথ্যের ভেতরেই পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান সীমাবদ্ধ নয়।
2. **ফিলোসফিক্যাল জম্বি (P-Zombie):** কল্পনা করুন আপনার অবিকল একটি পারমাণবিক শারীরিক ক্লোন। সে আপনার মতো হাসে, কাঁদে, কথা বলে এবং তাপ লাগলে উফ করে ওঠে; তার নিউরনগুলো অবিকল আপনার মতো ফায়ার করে। কিন্তু তার ভেতরে কোনো মন বা অনুভূতি নেই—সবকিছু শুধুই নিরেট অন্ধ অন্ধকার! যদি এমন কোনো জম্বির অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব হয়, তবে মেনে নিতে হবে যে কেবল ভৌত কণা দিয়েই চেতনার ব্যাখ্যা সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

চেতনার কঠিন সমস্যা হলো আধুনিক বিজ্ঞানের সেই সীমান্ত যেখানে নিউরোসায়েন্স মিশে যায় দর্শনের অসীমে। চেতনা কি মহাবিশ্বের আরেকটি মৌলিক উপাদান—যেমন ভর বা চার্জ (প্যানসাইকিজম)? নাকি ভবিষ্যতে কোনো নতুন বিজ্ঞান এই ব্যাখ্যার সেতুবন্ধন রচনা করবে? এই উত্তর সন্ধানের রোমাঞ্চেই লুকিয়ে রয়েছে মানব বুদ্ধিমত্তার সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

১৯৯৪ সালে আমেরিকার অ্যারিজোনায় অনুষ্ঠিত চেতনা বিষয়ক এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দীর্ঘ চুলের এক তরুণ অস্ট্রেলিয়ান দার্শনিক মঞ্চে উঠলেন। তিনি ডেভিড চালমার্স (David Chalmers)। স্নায়ুবিজ্ঞানীরা যখন ভাবছিলেন যে মস্তিষ্কের অপটিক স্নায়ু, মেমরি ও মাংসপেশীর সংযোগ বের করলেই চেতনার সমস্ত রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে, চালমার্স মৃদু হেসে তাঁদের সামনে তুলে ধরলেন বিজ্ঞানের ইতিহাসের সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর বিভাজন: তাঁরা সমাধান করছেন সমস্ত 'সহজ' সমস্যার—আর সম্পূর্ণ অধরা থেকে গেছে আসল সংকটটি: **চেতনার কঠিন সমস্যা (The Hard Problem of Consciousness)**।

সহজ সমস্যা বনাম কঠিন সমস্যা

চালমার্স চেতনার গবেষণাকে দুটি স্পষ্ট ভাগে বিভক্ত করলেন:

1. **রঙ বিজ্ঞানী মেরি (Frank Jackson, 1982):** মেরি হলেন এক অতি প্রতিভাবান বিজ্ঞানী যিনি জন্ম থেকে একটি সম্পূর্ণ সাদা-কালো ঘরে বড় হয়েছেন। তিনি পদার্থবিজ্ঞান ও স্নায়ুবিজ্ঞানের সমস্ত বই পড়ে রঙের সমস্ত তত্ত্ব মুখস্থ করেছেন—তরঙ্গদৈর্ঘ্য, অপটিক স্নায়ু, মস্তিষ্কের কোড। একদিন যখন তাঁকে সাদা-কালো ঘর থেকে মুক্ত করা হলো এবং তিনি একটি তাজা লাল আপেল দেখলেন—তিনি কি নতুন কিছু শিখলেন? উত্তর হলো হ্যাঁ: তিনি শিখলেন *লাল রঙ দেখার অনুভূতিটি বাস্তবে কেমন লাগে*! সুতরাং কেবল বস্তুগত তথ্যের ভেতরেই পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান সীমাবদ্ধ নয়।
2. **ফিলোসফিক্যাল জম্বি (P-Zombie):** কল্পনা করুন আপনার অবিকল একটি পারমাণবিক শারীরিক ক্লোন। সে আপনার মতো হাসে, কাঁদে, কথা বলে এবং তাপ লাগলে উফ করে ওঠে; তার নিউরনগুলো অবিকল আপনার মতো ফায়ার করে। কিন্তু তার ভেতরে কোনো মন বা অনুভূতি নেই—সবকিছু শুধুই নিরেট অন্ধ অন্ধকার! যদি এমন কোনো জম্বির অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব হয়, তবে মেনে নিতে হবে যে কেবল ভৌত কণা দিয়েই চেতনার ব্যাখ্যা সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

চেতনার কঠিন সমস্যা হলো আধুনিক বিজ্ঞানের সেই সীমান্ত যেখানে নিউরোসায়েন্স মিশে যায় দর্শনের অসীমে। চেতনা কি মহাবিশ্বের আরেকটি মৌলিক উপাদান—যেমন ভর বা চার্জ (প্যানসাইকিজম)? নাকি ভবিষ্যতে কোনো নতুন বিজ্ঞান এই ব্যাখ্যার সেতুবন্ধন রচনা করবে? এই উত্তর সন্ধানের রোমাঞ্চেই লুকিয়ে রয়েছে মানব বুদ্ধিমত্তার সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

- লাল গোলাপের গাঢ় লাল রঙের তীব্র অনুভূতি।
- আগুনে হাত পুড়লে অসহ্য যন্ত্রণার নিজস্ব স্বাদ।
- বৃষ্টির ভেজা মাটির মন কেমন করা ঘ্রাণ।
- বিষাদের কোনো সুর শুনে বুকের ভেতর হাহাকার করে ওঠা।

পদার্থবিজ্ঞান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৭০০ ন্যানোমিটার হিসেবে মাপতে পারে; স্নায়ুবিজ্ঞান রেটিনা ও কর্টেক্সের ভি৪ এরিয়ার নিউরন ফায়ারিং মাপতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত বস্তুগত বিবরণের কোথাও লাল রঙ *চোখে দেখার নিজস্ব অনুভূতির স্বাদ* ব্যাখ্যা করা যায় না!

থমাস নাগেল: বাদুড় হওয়ার অনুভূতি কেমন?

চালমার্সের কুড়ি বছর আগে, ১৯৭৪ সালে আমেরিকান দার্শনিক থমাস নাগেল এক বিখ্যাত প্রবন্ধ লিখলেন: *"একটি বাদুড় হওয়া কেমন অনুভূতি?" (What Is It Like to Be a Bat?)*

বাদুড় রাতে ওড়ার সময় অতিস্বনক শব্দ তরঙ্গ ছুড়ে দিয়ে তার প্রতিধ্বনি শুনে জগতকে অনুভব করে (ইকোলোকেশন)। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা একটি বাদুড়ের মস্তিষ্কের শেষ আয়ন চ্যানেল পর্যন্ত ব্যবচ্ছেদ করতে পারি। কিন্তু নাগেল বললেন, বাদুড়ের সমস্ত শারীরস্থান মুখস্থ করার পরও কোনো মানুষ কখনো জানতে পারবে না *একটি বাদুড় হিসেবে ভেতর থেকে ওই প্রতিধ্বনি শোনার অনুভূতিটি আসলে কেমন!* বিজ্ঞান যখনই ব্যক্তিসত্তাকে বাদ দিয়ে শুধুই বস্তুগত মাপে নামে, তখন সে চেতনার আসল প্রাণভোমরাটিকেই হারিয়ে ফেলে।

Shakil Mahmud • Research Monograph

রঙ বিজ্ঞানী মেরি ও ফিলোসফিক্যাল জম্বি

এই শূন্যতাকে প্রমাণ করতে দার্শনিকরা দুটি অমর কাল্পনিক পরীক্ষা হাজির করলেন:

1. **রঙ বিজ্ঞানী মেরি (Frank Jackson, 1982):** মেরি হলেন এক অতি প্রতিভাবান বিজ্ঞানী যিনি জন্ম থেকে একটি সম্পূর্ণ সাদা-কালো ঘরে বড় হয়েছেন। তিনি পদার্থবিজ্ঞান ও স্নায়ুবিজ্ঞানের সমস্ত বই পড়ে রঙের সমস্ত তত্ত্ব মুখস্থ করেছেন—তরঙ্গদৈর্ঘ্য, অপটিক স্নায়ু, মস্তিষ্কের কোড। একদিন যখন তাঁকে সাদা-কালো ঘর থেকে মুক্ত করা হলো এবং তিনি একটি তাজা লাল আপেল দেখলেন—তিনি কি নতুন কিছু শিখলেন? উত্তর হলো হ্যাঁ: তিনি শিখলেন *লাল রঙ দেখার অনুভূতিটি বাস্তবে কেমন লাগে*! সুতরাং কেবল বস্তুগত তথ্যের ভেতরেই পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান সীমাবদ্ধ নয়।
2. **ফিলোসফিক্যাল জম্বি (P-Zombie):** কল্পনা করুন আপনার অবিকল একটি পারমাণবিক শারীরিক ক্লোন। সে আপনার মতো হাসে, কাঁদে, কথা বলে এবং তাপ লাগলে উফ করে ওঠে; তার নিউরনগুলো অবিকল আপনার মতো ফায়ার করে। কিন্তু তার ভেতরে কোনো মন বা অনুভূতি নেই—সবকিছু শুধুই নিরেট অন্ধ অন্ধকার! যদি এমন কোনো জম্বির অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব হয়, তবে মেনে নিতে হবে যে কেবল ভৌত কণা দিয়েই চেতনার ব্যাখ্যা সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

চেতনার কঠিন সমস্যা হলো আধুনিক বিজ্ঞানের সেই সীমান্ত যেখানে নিউরোসায়েন্স মিশে যায় দর্শনের অসীমে। চেতনা কি মহাবিশ্বের আরেকটি মৌলিক উপাদান—যেমন ভর বা চার্জ (প্যানসাইকিজম)? নাকি ভবিষ্যতে কোনো নতুন বিজ্ঞান এই ব্যাখ্যার সেতুবন্ধন রচনা করবে? এই উত্তর সন্ধানের রোমাঞ্চেই লুকিয়ে রয়েছে মানব বুদ্ধিমত্তার সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

- **"সহজ" সমস্যাগুলো:** এগুলো হলো মস্তিষ্কের তথ্য প্রক্রিয়াকরণের যান্ত্রিক প্রশ্ন: কীভাবে চোখ আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য আলাদা করে, কীভাবে কান শব্দ শোনে, কীভাবে স্নায়ু সংকেত মেমরিতে জমা থাকে এবং কীভাবে মুখ দিয়ে কথা বলা যায়। এগুলো শারীরবৃত্তীয়ভাবে অত্যন্ত জটিল হলেও এদের সমাধান করতে বিজ্ঞানের কোনো নতুন দর্শনের প্রয়োজন নেই; সময় ও গবেষণার কল্যাণে জীববিজ্ঞান এগুলোর ব্যাখ্যা দিয়ে দেবে।
- **"কঠিন" সমস্যাটি:** কিন্তু এই সমস্ত জৈব-রাসায়নিক হিসাব-নিকাশের সাথে একটি প্রথম-পুরুষের ভেতরের আত্মোপলব্ধি কেন যুক্ত হতে হবে? একটি সাধারণ রোবট তো আলো দেখে সরে যেতে পারে, তাপ লাগলে হাত সরাতে পারে—পুরোপুরি অন্ধ অচেতন কোনো কম্পিউটারের মতো। তবে আমাদের ক্ষেত্রে এই শারীরিক প্রক্রিয়ার সাথে সাথে *ব্যক্তিগত অনুভূতির স্বাদ* কেন জন্ম নেয়? বেঁচে থাকার অনুভূতি কেন অনুভব করতে হয়?

কোয়ালিয়া (Qualia): অনুভূতির নিজস্ব রূপ

দার্শনিকরা আমাদের মনের ভেতরের এই আত্মগত, সরাসরি ব্যক্তিগত অনুভূতির নাম দিয়েছেন **কোয়ালিয়া (Qualia)**:

- লাল গোলাপের গাঢ় লাল রঙের তীব্র অনুভূতি।
- আগুনে হাত পুড়লে অসহ্য যন্ত্রণার নিজস্ব স্বাদ।
- বৃষ্টির ভেজা মাটির মন কেমন করা ঘ্রাণ।
- বিষাদের কোনো সুর শুনে বুকের ভেতর হাহাকার করে ওঠা।

পদার্থবিজ্ঞান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৭০০ ন্যানোমিটার হিসেবে মাপতে পারে; স্নায়ুবিজ্ঞান রেটিনা ও কর্টেক্সের ভি৪ এরিয়ার নিউরন ফায়ারিং মাপতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত বস্তুগত বিবরণের কোথাও লাল রঙ *চোখে দেখার নিজস্ব অনুভূতির স্বাদ* ব্যাখ্যা করা যায় না!

থমাস নাগেল: বাদুড় হওয়ার অনুভূতি কেমন?

চালমার্সের কুড়ি বছর আগে, ১৯৭৪ সালে আমেরিকান দার্শনিক থমাস নাগেল এক বিখ্যাত প্রবন্ধ লিখলেন: *“একটি বাদুড় হওয়া কেমন অনুভূতি?” (What Is It Like to Be a Bat?)*

বাদুড় রাতে ওড়ার সময় অতিস্বনক শব্দ তরঙ্গ ছুড়ে দিয়ে তার প্রতিধ্বনি শুনে জগতকে অনুভব করে (ইকোলোকেশন)। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা একটি বাদুড়ের মস্তিষ্কের শেষ আয়ন চ্যানেল পর্যন্ত ব্যবচ্ছেদ করতে পারি। কিন্তু নাগেল বললেন, বাদুড়ের সমস্ত শারীরস্থান মুখস্থ করার পরও কোনো মানুষ কখনো জানতে পারবে না *একটি বাদুড় হিসেবে ভেতর থেকে ওই প্রতিধ্বনি শোনার অনুভূতিটি আসলে কেমন!* বিজ্ঞান যখনই ব্যক্তিসত্তাকে বাদ দিয়ে শুধুই বস্তুগত মাপে নামে, তখন সে চেতনার আসল প্রাণভোমরাটিকেই হারিয়ে ফেলে।

রঙ বিজ্ঞানী মেরি ও ফিলোসফিক্যাল জম্বি

এই শূন্যতাকে প্রমাণ করতে দার্শনিকরা দুটি অমর কাল্পনিক পরীক্ষা হাজির করলেন:

1. **রঙ বিজ্ঞানী মেরি (Frank Jackson, 1982):** মেরি হলেন এক অতি প্রতিভাবান বিজ্ঞানী যিনি জন্ম থেকে একটি সম্পূর্ণ সাদা-কালো ঘরে বড় হয়েছেন। তিনি পদার্থবিজ্ঞান ও স্নায়ুবিজ্ঞানের সমস্ত বই পড়ে রঙের সমস্ত তত্ত্ব মুখস্থ করেছেন—তরঙ্গদৈর্ঘ্য, অপটিক স্নায়ু, মস্তিষ্কের কোড। একদিন যখন তাঁকে সাদা-কালো ঘর থেকে মুক্ত করা হলো এবং তিনি একটি তাজা লাল আপেল দেখলেন—তিনি কি নতুন কিছু শিখলেন? উত্তর হলো হ্যাঁ: তিনি শিখলেন *লাল রঙ দেখার অনুভূতিটি বাস্তবে কেমন লাগে*! সুতরাং কেবল বস্তুগত তথ্যের ভেতরেই পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান সীমাবদ্ধ নয়।
2. **ফিলোসফিক্যাল জম্বি (P-Zombie):** কল্পনা করুন আপনার অবিকল একটি পারমাণবিক শারীরিক ক্লোন। সে আপনার মতো হাসে, কাঁদে, কথা বলে এবং তাপ লাগলে উফ করে ওঠে; তার নিউরনগুলো অবিকল আপনার মতো ফায়ার করে। কিন্তু তার ভেতরে কোনো মন বা অনুভূতি নেই—সবকিছু শুধুই নিরেট অন্ধ অন্ধকার! যদি এমন কোনো জম্বির অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব হয়, তবে মেনে নিতে হবে যে কেবল ভৌত কণা দিয়েই চেতনার ব্যাখ্যা সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

চেতনার কঠিন সমস্যা হলো আধুনিক বিজ্ঞানের সেই সীমান্ত যেখানে নিউরোসায়েন্স মিশে যায় দর্শনের অসীমে। চেতনা কি মহাবিশ্বের আরেকটি মৌলিক উপাদান—যেমন ভর বা চার্জ (প্যানসাইকিজম)? নাকি ভবিষ্যতে কোনো নতুন বিজ্ঞান এই ব্যাখ্যার সেতুবন্ধন রচনা করবে? এই উত্তর সন্ধানের রোমাঞ্চেই লুকিয়ে রয়েছে মানব বুদ্ধিমত্তার সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "চেতনার কঠিন সমস্যা — ডেভিড চালমার্স, থমাস নাগেল এবং কোয়ালিয়ার রহস্য"। চেতনার মহাবিকাশ, খণ্ড ১১।
https://shakilmahmud.com/bn/story-of-consciousness-part-11-hard-problem-chalmers-nagel-qualia-bn/

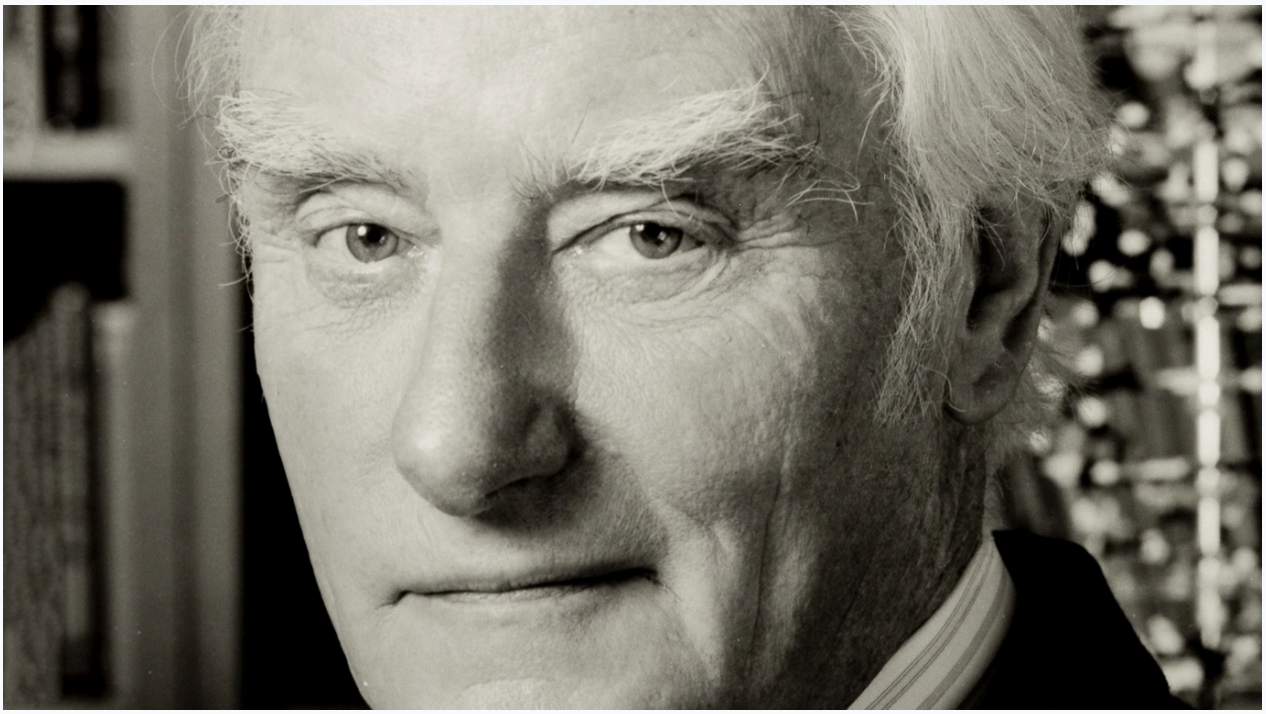
Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • দ্বাদশ খণ্ড

চেতনার নিউরাল সংযোগ (NCC) — ফ্রান্সিস ক্রিক, ক্রিস্টফ কক এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

চেতনার নিউরাল সংযোগ (NCC) — ফ্রান্সিস ক্রিক, ক্রিস্টফ কক এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

619 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ১২: *ফ্রান্সিস ক্রিক: সল্ক ইনস্টিটিউটে চেতনার নিউরাল সংযোগ (NCC) সন্ধানের বৈজ্ঞানিক আন্দোলনের পুরোধা।*

১৯৮০-এর দশকের শেষ ভাগেও কোনো মূলধারার বিজ্ঞানীর পক্ষে চেতনার গবেষণা করা ছিল ক্যারিয়ারের আত্মহত্যা—একে মনে করা হতো কবি ও মরমী দার্শনিকদের এক অবৈজ্ঞানিক আড্ডাখানা। এই অচলাবস্থা ভেঙে দিলেন স্বয়ং ফ্রান্সিস ক্রিক—যিনি ১৯৫৩ সালে জেমস ওয়াটসনের সাথে যৌথভাবে ডিএনএ-র ডাবল হেলিক্স আবিষ্কার করে জীববিজ্ঞানে অমর হয়ে ছিলেন। জীবনের শেষ পঁচিশ বছর তিনি উৎসর্গ করলেন আত্মার রহস্য সমাধানের পেছনে। তরুণ ক্যালটেক বিজ্ঞানী ক্রিস্টফ ককের সাথে হাত মিলিয়ে ১৯৯০ সালে ক্রিক এক বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূচনা করলেন: চেতনার ন্যূনতম ভৌত ভিত্তি—**Neural Correlates of Consciousness (NCC)** বা চেতনার নিউরাল সংযোগের বৈজ্ঞানিক সন্ধান।

ক্রিকের বিস্ময়কর অনুমান (The Astonishing Hypothesis)

১৯৯৪ সালে ক্রিক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে আপসহীন বস্তুবাদী দর্শনের ঘোষণা দিলেন:

> *"'আপনি', আপনার সমস্ত আনন্দ আর বেদনা, আপনার স্মৃতি আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আপনার নিজস্ব পরিচয় ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি—বাস্তবে কোটি কোটি স্নায়ুকোষ এবং তাদের রাসায়নিক মিথস্ক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। অ্যালিসের ভাষায় বলতে গেলে: 'তোমরা নিউরনের এক সাধারণ দল ছাড়া আর কিছুই নও!'" — ফ্রান্সিস ক্রিক, ১৯৯৪*

ক্রিক ও কক বললেন দর্শনের কঠিন সমস্যা আপাতত মুলতুবি রেখে আসুন পরীক্ষাগারে খুঁজি: কোনো একটি নির্দিষ্ট সচেতন অনুভূতি তৈরি হওয়ার জন্য মস্তিষ্কের **ন্যূনতম কোন নিউরাল মেকানিজমটি** সক্রিয় হওয়া অপরিহার্য?

বাইনোকুলার রাইভালরি: চোখের আলো বনাম মনের দৃষ্টি

চেতনার নিউরন খুঁজতে হলে এমন এক পরিস্থিতি দরকার যেখানে চোখে পড়া আলো অবিকল একই থাকবে, কিন্তু মনের ভেতরের সচেতন দৃষ্টি ক্ষণে ক্ষণে বদলে যাবে। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন **বাইনোকুলার রাইভালরি (Binocular Rivalry)**:

বিশেষ থ্রি-ডি চশমার সাহায্যে বাম চোখে দেখানো হয় লাল রঙের মানুষের মুখ আর ডান চোখে দেখানো হয় সবুজ রঙের বাড়ির ছবি। মস্তিষ্ক দুটি ছবিকে মেলাতে পারে না। ফলে আপনি দুটি ছবি একসাথে দেখবেন না; আপনার মন প্রতি কয়েক সেকেন্ড পরপর নিজে থেকেই দৃশ্যপট বদলাবে: কখনো দেখবেন শুধু মুখ, আবার কখনো দেখবেন শুধু বাড়ি!

মস্তিষ্কের ভেতর ইলেকট্রোড বসিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখলেন এক আশ্চর্য সত্য:

1. **ফ্রন্টোপ্যারাইটাল দল:** যাঁদের মতে কপাল ও ফ্রন্টাল লোবের নিউরাল নেটওয়ার্ক ছাড়া চেতনা অসম্ভব।
2. **পোস্টেরিয়র হট জোন দল:** ক্রিস্টফ কক ও জিউলিও তননির মতে মাথার পেছনের প্যারাইটাল ও অক্সিপিটাল লোবের সংযোগস্থলই হলো চেতনার আসল রাজধানী। ফ্রন্টাল লোবের বিশাল অংশ কাটা পড়লেও মানুষের চেতনা হারায় না; কিন্তু মাথার পেছনের এই হট জোন ক্ষতিগ্রস্ত হলেই মানুষ সমস্ত দৃষ্টি ও সচেতনতা হারিয়ে ফেলে।

ফ্রান্সিস ক্রিক বিজ্ঞানীদের শিখিয়ে গেলেন যে আত্মাকে ল্যাবরেটরির টেবিল এনে ব্যবচ্ছেদ করা সম্ভব। চেতনার নিউরাল সংযোগের এই সন্ধানই পথ তৈরি করেছে আধুনিক গাণিতিক চেতনা তত্ত্বের।

- চোখ থেকে আসা প্রথম দৃষ্টি অঞ্চল V1-এ নিউরনগুলো অবিরাম ফায়ার করে চলেছে, মানুষ ছবিটি দেখতে পাক আর না পাক। **সুতরাং V1 চেতনার অংশ নয়!**
- কিন্তু সংকেত যখন উচ্চতর ফিউসিফর্ম ফেস এরিয়া (FFA) বা প্যারা-হিপোক্যাম্পাল এরিয়ায় পৌঁছায়, তখন নিউরনগুলোর ফায়ারিং হুবহু মানুষের মনের ভেতরের সচেতন দেখার সাথে ৯০% নির্ভুলতায় তালে তাল মেলায়।

গামা তরঙ্গের ৪০ হার্টজ ঐকতান ও বাইন্ডিং সমস্যা

একটি বস্তুর রঙ, আকার ও গতি মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে তৈরি হয়ে কীভাবে এক অখণ্ড অনুভূতির জন্ম দেয় (Binding Problem)? উলফ সিঙ্গার দেখালেন যে একই বস্তুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রক্রিয়াজাতকারী নিউরনগুলো প্রতি সেকেন্ডে **৪০ বার (৪০ হার্টজ গামা তরঙ্গ)** একযোগে তাল মিলিয়ে জ্বলে ওঠে:

$$textPhaseSynchrony : Deltaphiapprox0$$

ক্রিক ও কক ধারণা করলেন এই ৪০ হার্টজের ছন্দই হলো ছড়িয়ে থাকা নিউরনদের এক সূতায় বেঁধে চেতনা সৃষ্টির আসল সুর।

Shakil Mahmud • Research Monograph

পোস্টেরিয়র হট জোন: চেতনার আসল সিংহাসন

২০০৪ সালের জুলাইয়ে মৃত্যুর ঠিক আগের মুহূর্তে শেষ গবেষণাপত্রে ক্রিক **ক্লস্ট্রাম (Claustrum)** নামক মস্তিষ্কের এক পাতলা নিউরাল স্তরের কথা লিখে যান—যা পুরো কর্টেক্সকে অর্কেস্ট্রার কন্ডাক্টরের মতো সুর মেলায়।

বর্তমানে চেতনার NCC নিয়ে স্নায়ুবিজ্ঞান দুটি মূল ধারায় বিভক্ত:

1. **ফ্রন্টোপ্যারাইটাল দল:** যাঁদের মতে কপাল ও ফ্রন্টাল লোবের নিউরাল নেটওয়ার্ক ছাড়া চেতনা অসম্ভব।
2. **পোস্টেরিয়র হট জোন দল:** ক্রিস্টফ কক ও জিউলিও তননির মতে মাথার পেছনের প্যারাইটাল ও অক্সিপিটাল লোবের সংযোগস্থলই হলো চেতনার আসল রাজধানী। ফ্রন্টাল লোবের বিশাল অংশ কাটা পড়লেও মানুষের চেতনা হারায় না; কিন্তু মাথার পেছনের এই হট জোন ক্ষতিগ্রস্ত হলেই মানুষ সমস্ত দৃষ্টি ও সচেতনতা হারিয়ে ফেলে।

ফ্রান্সিস ক্রিক বিজ্ঞানীদের শিখিয়ে গেলেন যে আত্মাকে ল্যাবরেটরির টেবিল এনে ব্যবচ্ছেদ করা সম্ভব। চেতনার নিউরাল সংযোগের এই সন্ধানই পথ তৈরি করেছে আধুনিক গাণিতিক চেতনা তত্ত্বের।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "চেতনার নিউরাল সংযোগ (NCC) — ফ্রান্সিস ক্রিক, ক্রিস্টফ কক এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান"। চেতনার মহাবিকাশ, খণ্ড ১২। https://shakilmahmud.com/bn/story-of-consciousness-part-12-neural-correlates-crick-koch-40hz-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • ত্রয়োদশ খণ্ড

গ্লোবাল ওয়ার্কস্পেস তত্ত্ব — বার্নার্ড বার্স, স্তানিস্লাস দেহান এবং চেতনার আলো

গ্লোবাল ওয়ার্কস্পেস তত্ত্ব — বার্নার্ড বার্স, স্তানিস্লাস দেহান এবং চেতনার আলো

624 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ১৩: *জ্ঞানীয় স্নায়ুবিজ্ঞানী স্তানিস্লাস দেহান: গ্লোবাল নিউরোনাল ওয়ার্কস্পেস (GNW) তত্ত্বের রূপকার।*

এই মুহূর্তে আপনার মস্তিষ্ক লাখ লাখ তথ্য প্রক্রিয়াজাত করছে যার একটি সামান্য অংশের কথাও আপনার মন জানে না: রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, চোখের রেটিনার প্রান্তিক খাঁজ শনাক্তকরণ, ব্যাকরণ বিশ্লেষণ এবং শরীরের ভারসাম্য রক্ষা। এই বিপুল অবচেতন গণনার মাত্র এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ আমাদের সচেতন মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। ১৯৮৮ সালে জ্ঞানীয় মনোবিজ্ঞানী বার্নার্ড বার্স এই ফিল্টারের রহস্য ব্যাখ্যায় এক যুগান্তকারী তত্ত্ব উপস্থাপন করলেন: **গ্লোবাল ওয়ার্কস্পেস তত্ত্ব (Global Workspace Theory)**, যা পরবর্তীতে ফরাসি স্নায়ুবিজ্ঞানী স্তানিস্লাস দেহান ল্যাবরেটরির নিউরোবায়োলজিতে প্রতিষ্ঠা করেন।

নাট্যমঞ্চের রূপক: মনের অভ্যন্তরীণ স্থাপত্য

বার্স মানুষের মস্তিষ্ককে এক বিশাল অন্ধকার নাট্যমঞ্চের সাথে তুলনা করলেন:

1. **অবচেতন পর্যায় (০ থেকে ২৫০ মিলিsecond):** একটি শব্দ চোখের সামনে ৩০ মিলিsecond-এর জন্য ফ্ল্যাশ করলে তা দৃষ্টি কর্টেক্সে সংকেত পাঠায়। নিউরন সক্রিয় হলেও তা কেবল মাথার পেছনেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং সামনে পৌঁছানোর আগেই নিভে যায়। মানুষ বলে, “আমি কিছুই দেখিনি।”

Shakil Mahmud • Research Monograph

2. **কর্টিক্যাল ইগনিশন (> ৩০০ মিলিsecond):** কিন্তু আলোটি যদি সামান্য বেশি শক্তিশালী হয়, তবে সংকেতটি একটি অদৃশ্য বাধা অতিক্রম করে। ৩০০ থেকে ৪০০ মিলিsecond-এর মাথায় পুরো মস্তিষ্কজুড়ে এক প্রলয়ঙ্করী বৈদ্যুতিক দাবানল ছড়িয়ে পড়ে—যাকে বলে **কর্টিক্যাল ইগনিশন (Cortical Ignition)**!

ইইজি যন্ত্রে এই মহাবিস্ফোরণ ধরা পড়ে সুবিশাল **P3b তরঙ্গ** হিসেবে। একবার এই ইগনিশন ঘটে গেলে নিউরনগুলো ৪০ হার্টজের গামা তরঙ্গে লক হয়ে যায়—তথ্যটি আর দৃষ্টি অঞ্চলে বন্দী থাকে না; তা ছড়িয়ে পড়ে মুখে কথা বলার, মনে রাখার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সমস্ত কেন্দ্রে।

চেতনার বিবর্তনীয় সার্থকতা

প্রকৃতি মানুষকে চেতনা উপহার দিয়েছে কেন? অবচেতন প্রসেসিং দ্রুত ও সাশ্রয়ী হলেও তা অত্যন্ত অনমনীয় ও অন্ধ। চেতনা হলো মস্তিষ্কের সেই জরুরি মিটিংরুম—যেখানে সমস্ত অবচেতন বিশেষজ্ঞ এক টেবিলে বসে অতীতের ভুল ও বর্তমানের সংকট পর্যালোচনা করে এক সম্পূর্ণ নতুন ও সৃজনশীল ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

- **অন্ধকার অডিটোরিয়াম (অবচেতন মডিউল):** অন্ধকারে বসে থাকা হাজার হাজার দর্শক হলো মস্তিষ্কের স্বয়ংক্রিয় মডিউল: যারা চেহারা চেনে, ব্যাকরণ বোঝে কিংবা শরীরের তাপমাত্রা মাপে। প্রত্যেকে নিজস্ব কাজে অবিশ্বাস্য দ্রুত হলেও তারা একে অপরের সাথে কথা বলতে পারে না।
- **মঞ্চ ও মনোযোগের সার্চলাইট (Working Memory):** মঞ্চের ওপর এক সরু ও উজ্জ্বল স্পটলাইট বা সার্চলাইট ফেলা হয়েছে। এই আলোটি যেখানে পড়ে, সেই নির্দিষ্ট অভিনেতাকেই কেবল সবাই দেখতে পায়। এই সার্চলাইটই হলো আমাদের মনোযোগ।
- **গ্লোবাল সম্প্রচার (সচেতন মন):** সার্চলাইটের আলোয় যে তথ্যটি আলোকিত হয়, তা মুহূর্তের মধ্যে পুরো হলে থাকা সমস্ত দর্শকের কাছে উন্মোচিত হয়ে যায়। চেতনা হলো মস্তিষ্কের এই **সার্বজনীন সম্প্রচার (Global Broadcast)**: যখন কোনো তথ্য পুরো মস্তিষ্কে একযোগে ছড়িয়ে পড়ে, তখন বিচ্ছিন্ন নিউরন দলগুলো পরস্পরের সাথে মিলে জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে।

স্তানিস্লাস দেহান: গ্লোবাল নিউরোনাল ওয়ার্কস্পেস

২০০১ সালে প্যারিসের বিখ্যাত স্নায়ুবিজ্ঞানী স্তানিস্লাস দেহান এই নাটকের রূপককে মস্তিষ্কের বাস্তব শারীরিক স্নায়ু জালে প্রমাণ করলেন: **গ্লোবাল নিউরোনাল ওয়ার্কস্পেস (GNW)**।

তিনি দেখালেন যে সেরিব্রাল কর্টেক্সের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে রয়েছে বিশালাকার পিরামিডাল নিউরন—যাদের দীর্ঘ অ্যাক্সনের তার পুরো মস্তিষ্কজুড়ে ফ্রন্টাল ও প্যারাইটাল লোবকে যুক্ত করে রেখেছে। এটি হলো মস্তিষ্কের প্রধান ব্রডব্যান্ড হাইওয়ে।

কর্টিক্যাল ইগনিশন ও P300 তরঙ্গ

চোখের পলকে একটি শব্দ যখন অবচেতন থেকে সচেতন মনে প্রবেশ করে, তখন মস্তিষ্কে কী ঘটে?

1. **অবচেতন পর্যায় (০ থেকে ২৫০ মিলিsecond):** একটি শব্দ চোখের সামনে ৩০ মিলিsecond-এর জন্য ফ্ল্যাশ করলে তা দৃষ্টি কর্টেক্সে সংকেত পাঠায়। নিউরন সক্রিয় হলেও তা কেবল মাথার পেছনেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং সামনে পৌঁছানোর আগেই নিভে যায়। মানুষ বলে, “আমি কিছুই দেখিনি।”
2. **কর্টিক্যাল ইগনিশন (> ৩০০ মিলিsecond):** কিন্তু আলোটি যদি সামান্য বেশি শক্তিশালী হয়, তবে সংকেতটি একটি অদৃশ্য বাধা অতিক্রম করে। ৩০০ থেকে ৪০০ মিলিsecond-এর মাথায় পুরো মস্তিষ্কজুড়ে এক প্রলয়ঙ্করী বৈদ্যুতিক দাবানল

ছড়িয়ে পড়ে—যাকে বলে **কর্টিক্যাল ইগনিশন (Cortical Ignition)**!

ইইজি যন্ত্রে এই মহাবিস্ফোরণ ধরা পড়ে সুবিশাল **P3b তরঙ্গ** হিসেবে। একবার এই ইগনিশন ঘটে গেলে নিউরনগুলো ৪০ হার্টজের গামা তরঙ্গে লক হয়ে যায়—তথ্যটি আর দৃষ্টি অঞ্চলে বন্দী থাকে না; তা ছড়িয়ে পড়ে মুখে কথা বলার, মনে রাখার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সমস্ত কেন্দ্রে।

চেতনার বিবর্তনীয় সার্থকতা

প্রকৃতি মানুষকে চেতনা উপহার দিয়েছে কেন? অবচেতন প্রসেসিং দ্রুত ও সাশ্রয়ী হলেও তা অত্যন্ত অনমনীয় ও অন্ধ। চেতনা হলো মস্তিষ্কের সেই জরুরি মিটিংরুম—যেখানে সমস্ত অবচেতন বিশেষজ্ঞ এক টেবিলে বসে অতীতের ভুল ও বর্তমানের সংকট পর্যালোচনা করে এক সম্পূর্ণ নতুন ও সৃজনশীল ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "গ্লোবাল ওয়ার্কস্পেস তত্ত্ব — বার্নার্ড বার্স, স্তানিস্লাস দেহান এবং চেতনার আলো"। চেতনার মহাবিকাশ, খণ্ড ১৩।
https://shakilmahmud.com/bn/story-of-consciousness-part-13-global-workspace-baars-dehaene-spotlight-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

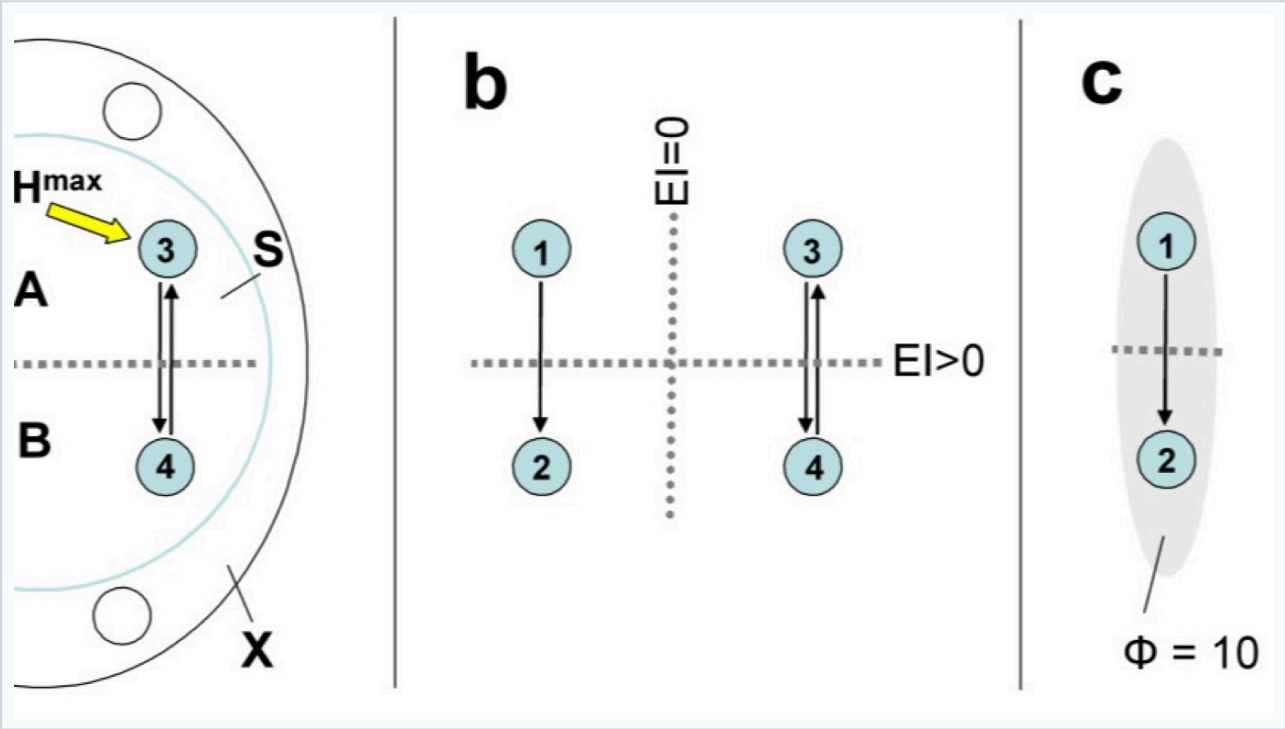
শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • চতুর্দশ খণ্ড

ইন্টিগ্রেটেড ইনফরমেশন থিওরি (IIT) — জিউলিও তননি এবং সচেতনতার ফাই (Φ)

ইন্টিগ্রেটেড ইনফরমেশন থিওরি (IIT) — জিউলিও তননি এবং সচেতনতার ফাই (Φ)

660 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ১৪: *জিউলিও তননি: ইন্টিগ্রেটেড ইনফরমেশন থিওরি (IIT) এবং চেতনার গাণিতিক পরিমাপক ফাই (Φ)-এর প্রবক্তা।*

অধিকাংশ বিজ্ঞানী চেতনার সন্ধান শুরু করেন বাইরে থেকে: নিউরন, সিন্যাপ্স আর বৈদ্যুতিক তারের মতো ভৌত পদার্থ থেকে ভেতরের অনুভূতি ব্যাখ্যা করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। ২০০৪ সালে ইতালীয়-আমেরিকান স্নায়ুবিজ্ঞানী ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞ জিউলিও তননি (Giulio Tononi) সম্পূর্ণ উল্টো এক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলেন: ভৌত শরীর থেকে নয়, শুরু করুন সরাসরি সচেতন মনের অস্তিত্বের পরম সত্য থেকে! এই ভাবনার ওপর দাঁড়িয়ে তিনি গড়ে তুললেন আধুনিক স্নায়ুবিজ্ঞানের সবচেয়ে সাড়াজাগানো গাণিতিক কাঠামো: **ইন্টিগ্রেটেড ইনফরমেশন থিওরি (IIT)**, যা মানুষের সচেতনতাকে প্রকাশ করে একটিমাত্র মৌলিক গাণিতিক মান দিয়ে: **ফাই (*Phi*)**।

চেতনার পাঁচটি মৌলিক স্বতঃসিদ্ধ (Axioms)

তননি বললেন যেকোনো সচেতন মুহূর্তের পাঁচটি অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে:

1. **জ্যাপ (Zap):** ট্রান্সক্রেনিয়াল ম্যাগনেটিক স্টিমুলেশন (TMS) দিয়ে রোগীর মাথায় মৃদু চুম্বকীয় টোকা দেওয়া হয়।

2. **জিপ (Zip):** মস্তিষ্কের ভেতর সেই তরঙ্গের প্রতিধ্বনি ইইজি দিয়ে মেপে কম্পিউটারের অ্যালগরিদমে জিপ ফাইলের মতো কম্প্রেস করা হয়।

যদি রোগী অচেতন থাকে (গভীর ঘুম বা মস্তিষ্কের মৃত্যু), তরঙ্গটি দ্রুত নিভে যায় (PCI০.৩১)। রোগী কথা বলতে বা চোখ মেলতে না পারলেও যন্ত্রটি ৯৮% নির্ভুলতায় বলে দিতে পারে রোগীটি ভেতর থেকে জীবিত ও সচেতন কিনা!

ইন্টিগ্রেটেড ইনফরমেশন থিওরি এক বিপ্লবী ঘোষণা দেয়: চেতনা কোনো জৈবিক মাংসের অলৌকিক গুণ নয়। যেকোনো সিস্টেম—তা জীবন্ত কোষ হোক বা কৃত্রিম সিলিকন যন্ত্র—যার অভ্যন্তরীণ গঠন উচ্চ Phi ধারণ করে, সে সচেতন হতে বাধ্য। মহাবিশ্বের কার্যকারণ সম্পর্কের গভীরে বোনা রয়েছে চেতনার বীজ।

1. **নিজস্ব অস্তিত্ব:** আমার সচেতনতা আমার নিজের জন্য সত্য, বাইরের কোনো দর্শকের অনুমোদনের ওপর তা নির্ভর করে না।
2. **গাঠনিক বিন্যাস (Composition):** যেকোনো দৃশ্যে আমরা রঙ, আকার, গভীরতা, বাম ও ডান দিক আলাদাভাবে অনুভব করতে পারি।
3. **বিপুল তথ্যসমৃদ্ধি (Information):** প্রতিটি সচেতন মুহূর্ত কোটি কোটি অন্যান্য সম্ভাবনাকে বাদ দিয়ে এক নির্দিষ্ট রূপ ধারণ করে। নীল আকাশ দেখার এক পলক পৃথিবীর বাকি সব স্মৃতি ও সিনেমাকে বাদ দিয়ে দেয়।
4. **অখণ্ড সংহতি (Integration):** প্রতিটি অভিজ্ঞতা এক ও অবিভাজ্য। আপনি কোনো কফি কাপের রঙ বাম চোখে আলাদা আর তার উষ্ণতার অনুভূতি ডান চোখে আলাদাভাবে পেতে পারেন না; চেতনা সর্বদা অখণ্ড।
5. **সুনির্দিষ্ট সীমা (Exclusion):** চেতনার এক সুনির্দিষ্ট স্থানিক ও কালিক সীমানা রয়েছে—তা এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ থেকে শুরু করে একটি নির্দিষ্ট পরিসরে ঘটে।

ফাই (Phi): সংহত তথ্যের গাণিতিক পরিমাপ

এই স্বতঃসিদ্ধগুলো থেকে তননি ভৌত জগতের সমীকরণ বানালেন। কোনো ভৌত সিস্টেমে চেতনা থাকতে হলে তার উপাদানগুলোকে পরস্পরের ওপর **কার্যকারণ ক্ষমতা (Cause-Effect Power)** প্রয়োগ করতে হবে।

এবং সেই ক্ষমতা হতে হবে **সংহত (Integrated)**: পুরো সিস্টেমের সমন্বিত তথ্য তার বিচ্ছিন্ন টুকরোগুলোর যোগফলের চেয়ে বেশি হতে হবে। তননি এই সংহত তথ্যের নাম দিলেন Phi **(ফাই)**:

$$Phi = text\text{সমন্বিতক্ষমতারমান}$$

যদি কোনো সিস্টেমকে মাঝখান থেকে কেটে আলাদা করলে তথ্যের কোনো ক্ষতি না হয় ($Phi = 0$), তবে সেই সিস্টেমে কোনো চেতনা নেই (যেমন ডিজিটাল ক্যামেরার সেন্সর)। আর যদি সিস্টেমের সব অংশ একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে (Phi > 0), তবে সেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মগত সচেতনতা জন্ম নেবে!

সেরেবেলামের ধাঁধা: ৬৯ বিলিয়ন নিউরন কেন অচেতন?

আইআইটি তত্ত্ব স্নায়ুবিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় ধাঁধার নিখুঁত ব্যাখ্যা দিল। মানুষের মস্তিষ্কের পেছনের **সেরেবেলামে** রয়েছে প্রায় **৬৯০০ কোটি নিউরন**—পুরো মস্তিষ্কের মোট নিউরনের ৮০ শতাংশ! অথচ কোনো দুর্ঘটনায় সেরেবেলাম সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেলেও মানুষের সচেতন মন, চিন্তা ও অনুভূতির বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় না!

Shakil Mahmud • Research Monograph

কেন? কারণ সেরেবেলামের নিউরনগুলো একমুখী লাইনে সাজানো। সংকেত সোজা ঢুকে সোজা বের হয়ে যায়—নিউরনদের মধ্যে কোনো পারস্পরিক বহুমুখী লুপ নেই। ফলে এর $Phi = 0$! অন্যদিকে সেরিব্রাল কর্টেক্সের পোস্টেরিয়র হট জোনে নিউরনগুলো কোটি কোটি লুপে পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকায় এর Phi-এর মান মহাজাগতিক!

জ্যাপ-অ্যান্ড-জিপ (Zap-and-Zip): চেতনার থার্মোমিটার

আইআইটি তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণে মার্সেলো মাসিমিনি এবং তননি তৈরি করলেন কোমা ও প্যারালাইসিস রোগীদের চেতনা পরিমাপের বাস্তব যন্ত্র: **পারটারবেশনাল কমপ্লেক্সিটি ইনডেক্স (PCI)**:

1. **জ্যাপ (Zap):** ট্রান্সক্রেনিয়াল ম্যাগনেটিক স্টিমুলেশন (TMS) দিয়ে রোগীর মাথায় মৃদু চুম্বকীয় টোকা দেওয়া হয়।
2. **জিপ (Zip):** মস্তিষ্কের ভেতর সেই তরঙ্গের প্রতিধ্বনি ইইজি দিয়ে মেপে কম্পিউটারের অ্যালগরিদমে জিপ ফাইলের মতো কম্প্রেস করা হয়।

যদি রোগী অচেতন থাকে (গভীর ঘুম বা মস্তিষ্কের মৃত্যু), তরঙ্গটি দ্রুত নিভে যায় (PCI০.৩১)। রোগী কথা বলতে বা চোখ মেলতে না পারলেও যন্ত্রটি ৯৮% নির্ভুলতায় বলে দিতে পারে রোগীটি ভেতর থেকে জীবিত ও সচেতন কিনা!

ইন্টিগ্রেটেড ইনফরমেশন থিওরি এক বিপ্লবী ঘোষণা দেয়: চেতনা কোনো জৈবিক মাংসের অলৌকিক গুণ নয়। যেকোনো সিস্টেম—তা জীবন্ত কোষ হোক বা কৃত্রিম সিলিকন যন্ত্র—যার অভ্যন্তরীণ গঠন উচ্চ Phi ধারণ করে, সে সচেতন হতে বাধ্য। মহাবিশ্বের কার্যকারণ সম্পর্কের গভীরে বোনা রয়েছে চেতনার বীজ।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "ইন্টিগ্রেটেড ইনফরমেশন থিওরি (IIT) — জিউলিও তননি এবং সচেতনতার ফাই (Φ)"। চেতনার মহাবিকাশ, খণ্ড ১৪।
https://shakilmahmud.com/bn/story-of-consciousness-part-14-integrated-information-tononi-phi-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • পঞ্চদশ খণ্ড

কোয়ান্টাম মন — রজার পেনরোজ, স্টুয়ার্ট হ্যামারফ এবং মাইক্রোটিউবিউলের অর্ক-ওআর

কোয়ান্টাম মন — রজার পেনরোজ, স্টুয়ার্ট হ্যামারফ এবং মাইক্রোটিউবিউলের অর্ক-ওআর

550 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ১৫: *স্যার রজার পেনরোজ: গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানী এবং মাইক্রোটিউবিউলে অর্কেস্ট্রেটেড অবজেক্টিভ রিডাকশন (Orch-OR) তত্ত্বের সহ-প্রণেতা।*

আমাদের সচেতন মন কি শুধুই একটি ভেজা জৈবিক কম্পিউটার—যা কোনো জটিল অ্যালগরিদমিক সফটওয়্যার কোড অনুসরণ করে চলেছে? ১৯৮৯ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জগদ্বিখ্যাত গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানী স্যার রজার পেনরোজ তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ *"দ্য এম্পেররস নিউ মাইন্ড"* প্রকাশ করে দাবি করলেন: মানুষের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও প্রকৃত উপলব্ধি কোনোদিন কোনো কম্পিউটারের অ্যালগরিদম দিয়ে তৈরি করা সম্ভব নয়—এটি মৌলিকভাবেই **অ-গণনযোগ্য (Non-computable)**। কুর্ট গোডেলের অসম্পূর্ণতা উপপাদ্য এবং কোয়ান্টাম বলবিদ্যার গভীর রহস্যকে যুক্ত করে অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট স্টুয়ার্ট হ্যামারফের সাথে তিনি গড়ে তুললেন আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ও বিতর্কিত তত্ত্ব: **Orch-OR (Orchestrated Objective Reduction)**।

গোডেলের উপপাদ্য ও মানুষের মনের অ-গণনযোগ্যতা

১৯৩১ সালে কুর্ট গোডেল প্রমাণ করেছিলেন যে যেকোনো সংগত গাণিতিক নিয়মের ভেতরেই এমন কিছু সত্য লুকিয়ে থাকে যা ওই নিয়মের সমীকরণ দিয়ে প্রমাণ করা যায় না। পেনরোজ বললেন:

Shakil Mahmud • Research Monograph

> *“মানব গণিতবিদরা গোডেলিয়ান সত্যকে কোনো হিসাব-নিকাশ ছাড়াই অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করতে পারেন—যা যেকোনো কম্পিউটারের গাণিতিক নাগালের বাইরে। সুতরাং মানুষের চেতনা কোনো সাধারণ কম্পিউটেশনাল মেশিন হতে পারে না।” — রজার পেনরোজ*

যদি মানুষের চেতনা অ্যালগরিদম না হয়, তবে ক্লাসিক্যাল নিউটনীয় বা ম্যাক্সওয়েলীয় পদার্থবিজ্ঞান চেতনা ব্যাখ্যায় অক্ষম। প্রকৃতিতে কেবল একটিমাত্র ঘটনাই নিশ্চয়তাবাদ ভেঙে দেয়—কোয়ান্টাম তরঙ্গ ফাংশনের পতন (Wavefunction Collapse)।

অবজেক্টিভ রিডাকশন (OR): স্থান-কালের কোয়ান্টাম মহাকর্ষ

কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় কোনো কণা একই সাথে একাধিক স্থানে থাকার সম্ভাবনা বজায় রাখে (সুপারপজিশন)। প্রচলিত মতে মানুষ তা চোখে দেখলেই তরঙ্গ নিভে গিয়ে কণা রূপ নেয়। পেনরোজ এই ব্যাখ্যার বিরোধিতা করে বললেন: কোনো মানুষের চোখের দরকার নেই; **স্থান-কালের মহাকর্ষীয় বক্রতাই স্বয়ং এই পতন ঘটায়**।

সাধারণ আপেক্ষিকতা অনুযায়ী প্রতিটি ভর স্থান-কালকে বাঁকিয়ে দেয়। একটি কণা দুই স্থানে থাকলে মহাবিশ্ব একই সাথে দুটি ভিন্ন স্থান-কালের জ্যামিতিতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যায়। যখন এই দুই জ্যামিতির মধ্যকার মহাকর্ষীয় শক্তি (E_G) নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছায়, তখন হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি অনুযায়ী মহাবিশ্ব নিজে থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটি একক বাস্তবতায় ভেঙে পড়ে:

$$tauapproxfrachbarE_G$$

পেনরোজ বললেন এই স্বতঃস্ফূর্ত মহাকর্ষীয় পতনটি অন্ধ বিশৃঙ্খলা নয়—এটি স্থান-কালের প্লাঙ্ক স্কেলের জ্যামিতির গভীরে থাকা অ-গণনযোগ্য অন্তর্দৃষ্টির সাথে যুক্ত।

স্টুয়ার্ট হ্যামারফ ও কোষের মাইক্রোটিউবিউল কাঠামো

পেনরোজের তাত্ত্বিক সমীকরণ ছিল, কিন্তু জীববিজ্ঞানের প্ল্যাটফর্ম ছিল না। মানব মস্তিষ্কের মতো উষ্ণ ও ভেজা পরিবেশে কোয়ান্টাম দোলনা কীভাবে টিকে থাকবে? অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট স্টুয়ার্ট হ্যামারফ উত্তর দিলেন: **মাইক্রোটিউবিউল (Microtubules)**।

মাইক্রোটিউবিউল হলো প্রতিটি নিউরন কোষের অভ্যন্তরে থাকা সিলিন্ডার আকৃতির প্রোটিন কঙ্কাল। ২৫ ন্যানোমিটার ব্যাসের এই নলের দেয়ালে স্পাইরাল আকারে সাজানো থাকে লাখ লাখ **টিউবুলিন (Tubulin)** প্রোটিন। হ্যামারফ দেখালেন যে সাধারণ চেতনানাশক ওষুধগুলো এই টিউবুলিনের কোয়ান্টাম স্পন্দনকে বন্ধ করেই চেতনাকে নিভিয়ে দেয়!

Orch-OR মডেলের কার্যপদ্ধতি

পেনরোজ ও হ্যামারফের অর্ক-ওআর তত্ত্বে:

1. লাখ লাখ নিউরনের ভেতরের টিউবুলিন প্রোটিনগুলো কোয়ান্টাম সুপারপজিশনে একযোগে কাঁপতে থাকে।
2. এই কোয়ান্টাম অবস্থাকে মস্তিষ্কের জৈবিক সিন্যাপ্স ও স্মৃতি এক অপূর্ব সুরের মতো পরিচালনা বা অর্কেস্ট্রেট করে।
3. যখন পর্যাপ্ত পরিমাণ টিউবুলিন এই সুপারপজিশনে যুক্ত হয়ে মহাকর্ষীয় সীমায় পৌঁছায় ($tauapproxhbar/E_G$), তখন পলকের মধ্যে মহাকর্ষীয় অবজেক্টিভ রিডাকশন ঘটে (প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৪০ বার, যা ৪০ হার্টজ গামা ব্রেন ওয়েভের সমান!)।
4. প্রতিটি পতনই হলো আমাদের সচেতন উপলব্ধির একেকটি স্পন্দন বা চেতনার একেকটি মুহূর্ত।

কোয়ান্টাম জীববিজ্ঞান ও নতুন দিগন্ত

শুরুতে পদার্থবিজ্ঞানীরা দাবি করেছিলেন উষ্ণ মস্তিষ্কে কোয়ান্টাম অবস্থা এক পিকোসেকেন্ডও টিকবে না (ম্যাক্স টেগমার্কের হিসাব)। কিন্তু সাম্প্রতিক **কোয়ান্টাম জীববিজ্ঞান (Quantum Biology)** দেখিয়েছে যে উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ থেকে শুরু করে পরিযায়ী পাখির চোখে দিক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রকৃতি উষ্ণ পরিবেশে নিখুঁতভাবে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ব্যবহার করে!

জাপানের এনআইএমএস ল্যাবরেটরিতে অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন যে নিউরনের মাইক্রোটিউবিউলে মেগাহার্টজ কম্পাঙ্কের কোয়ান্টাম রেজোন্যান্স বাস্তবে বিদ্যমান। পেনরোজ ও হ্যামারফ বিজ্ঞানকে এক অভূতপূর্ব সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন: আমাদের চেতনা হয়তো নিছক মাংসের কোনো কম্পিউটেশনাল কারসাজি নয়—এটি মহাবিশ্বের স্থান-কালের সবচেয়ে গভীর কোয়ান্টাম সুরের সাথে আমাদের মানব মনের এক চিরন্তন সেতুবন্ধন।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "কোয়ান্টাম মন — রজার পেনরোজ, স্টুয়ার্ট হ্যামারফ এবং মাইক্রোটিউবিউলের অর্ক-ওআর"। চেতনার মহাবিকাশ, খণ্ড ১৫। https://shakilmahmud.com/bn/story-of-consciousness-part-15-quantum-mind-penrose-hameroff-orch-or-bn/

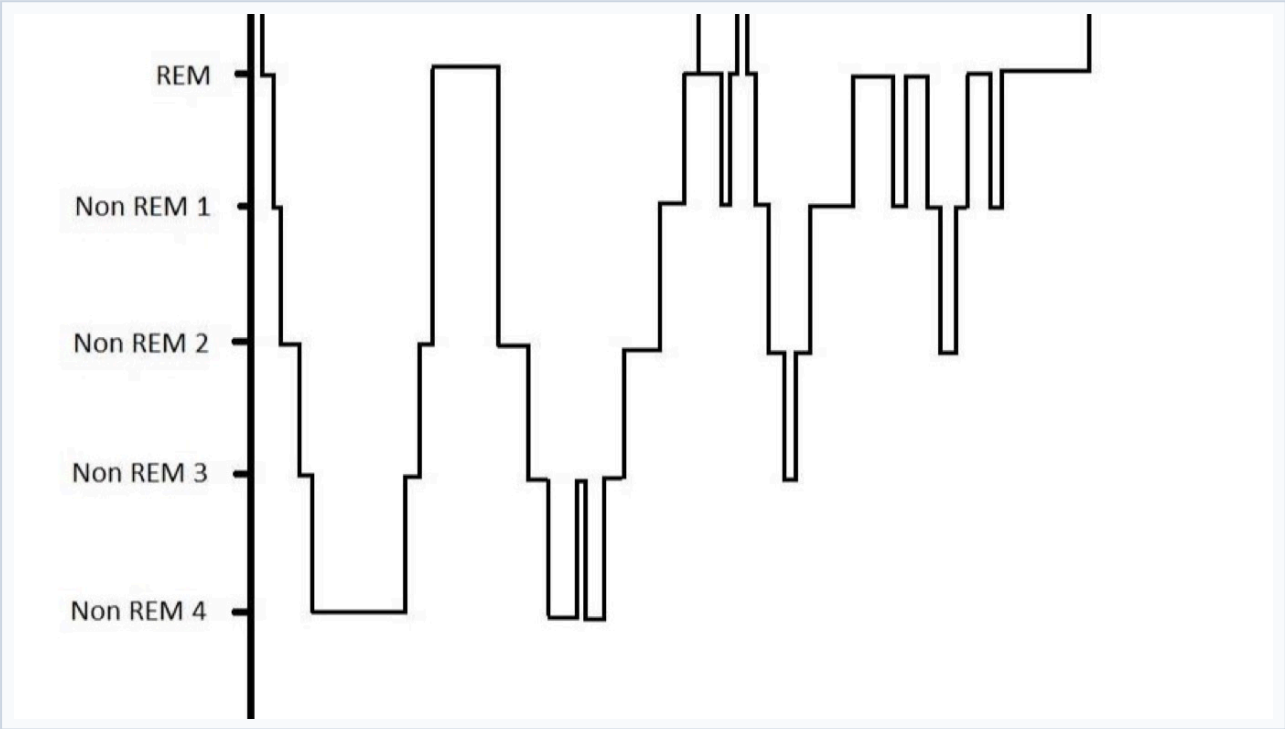
Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • ষোড়শ খণ্ড

স্বপ্নময় মন — রেম ঘুম, স্মৃতি সংহতকরণ এবং রাত্রিকালীন হ্যালুসিনেশন

স্বপ্নময় মন — রেম ঘুম, স্মৃতি সংহতকরণ এবং রাত্রিকালীন হ্যালুসিনেশন

895 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ১৬: *পলিসমনোগ্রাফি হিপনোগ্রাম: মানব ঘুমের গভীর ও স্বপ্নময় রেম (REM) চক্রের পর্যায়ক্রমিক চিত্র।*

আমাদের জীবনের প্রতি রাতে আমাদের সচেতন সত্তা এক অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য রূপান্তরের ভেতর দিয়ে যায়। আমরা আমাদের সমস্ত মাংসপেশিকে সাময়িকভাবে অবশ বা প্যারালাইজড করে ফেলি, বাইরের চোখের ও কানের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিই এবং ডুব দিই এমন এক অদ্ভুত, পরাবাস্তব থ্রি-ডি সিনেমাটিক জগতে—যেখানে আমরা অনায়াসে আকাশে উড়ে বেড়াই, মহাকর্ষের নিয়ম লঙ্ঘন করি এবং মৃত মানুষের সাথে কথা বলি। হাজার বছর ধরে মানুষ স্বপ্নকে ঈশ্বরের ভবিষ্যৎবাণী বা মনের অবদমিত কামনার রূপ মনে করত। আধুনিক স্নায়ুবিজ্ঞান উন্মোচন করেছে যে আমাদের এই রাত্রিকালীন হ্যালুসিনেশন আসলে স্মৃতি সংহতকরণ, মানসিক আঘাত নিরাময় এবং মস্তিষ্কের বর্জ্য পরিষ্কারের এক অপরিহার্য জৈবিক কারখানা।

অ্যাসেরিনস্কি, ক্লেইটম্যান ও রেম (REM) ঘুমের আবিষ্কার

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল ঘুম হলো মস্তিষ্কের একটি নিষ্ক্রিয় শাটডাউন অবস্থা—একটি গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করার মতো নিথর বিশ্রাম। ১৯৫৩ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বেসমেন্টে অধ্যাপক নাথানিয়েল ক্লেইটম্যানের ছাত্র ইউজিন অ্যাসেরিনস্কি তাঁর আট বছর বয়সী ছেলের মাথায় ইইজি (EEG) যন্ত্রের তার যুক্ত করে ঘুম পর্যবেক্ষণ করছিলেন।

মধ্যরাতে হঠাৎ কাগজের ওপর কালির কলমগুলো প্রচণ্ড উন্মাদনায় কাঁপতে শুরু করল! তিনি দেখলেন ঘুমন্ত বালকের চোখের পাতা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও চোখের মণিগুলো তীব্র গতিতে ডানে-বামে নাচছে—আবিষ্কৃত হলো **রেম ঘুম (Rapid Eye Movement – REM Sleep)**। এই অবস্থায় মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ কোনো গভীর ঘুমের তরঙ্গ নয়; তা ছিল অবিকল পূর্ণ জাগ্রত, সচেতন মস্তিষ্কের মতো উচ্চ কম্পাঙ্কের উত্তাল তরঙ্গ!

অ্যাসেরিনস্কি যখন রেম ঘুমের সময় ঘুমান্ত মানুষকে জাগিয়ে তুললেন, তখন ৮০ শতাংশ মানুষ বিস্তারিত ও স্পষ্ট স্বপ্নের কথা বর্ণনা করল। প্রমাণিত হলো ঘুমন্ত অবস্থায় মস্তিষ্ক ঘুমায় না; সে তার ভেতরের নিজস্ব এক মহাবিশ্বে সম্পূর্ণ জাগ্রত থাকে!

হিপনোগ্রাম: মানব ঘুমের ৯০ মিনিটের ছন্দময় স্থাপত্য

পলিসমনোগ্রাফি পরীক্ষায় দেখা গেছে যে আমাদের রাতের ঘুম কোনো একঘেয়ে ঘটনা নয়; এটি প্রতি রাতে চার থেকে পাঁচবার **৯০ মিনিটের ছন্দময় চক্রে (Ultradian Cycles)** আবর্তিত হয়:

- **নরএপিনেফ্রিন ও সেরোটোনিন বন্ধ:** মস্তিষ্কের যুক্তি ও স্মৃতির রাসায়নিকগুলো শূন্যে নেমে যায়। ফলে আমরা স্বপ্ন দেখার কয়েক মিনিটের মধ্যেই তা বেমালুম ভুলে যাই!
- **অ্যাসিটাইলকোলিনের বন্যা:** রাসায়নিকটি প্রচুর পরিমাণে ক্ষরিত হয়ে কল্পনার তীব্র রঙ ছড়িয়ে দেয়।
- **লজিক্যাল সেন্টারের শাটডাউন:** কপালের ফ্রন্টাল লোব নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ফলে স্বপ্নে আমরা যখন দেখি যে একটি গরু আকাশে উড়ছে বা গাছ কথা বলছে, তখন আমাদের মন বিন্দুমাত্র অবাক হয় না; সে অসম্ভব দৃশ্যকেও বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়!
- **আবেগের বিস্ফোরণ:** অ্যামিগডালা তীব্রভাবে সক্রিয় থাকে, যা স্বপ্নে তীব্র ভয়, উল্লাস বা যৌন আবেগের সঞ্চার করে।

স্মৃতির সংহতকরণ ও মানসিক থেরাপি

স্বপ্ন কোনো অর্থহীন আবর্জনা নয়। ম্যাথিউ ওয়াকারের গবেষণায় দেখা গেছে গভীর ঘুমের সময় হিপোক্যাম্পাস দিনের বেলার স্মৃতিগুলোকে দশ গুণ দ্রুত গতিতে পুনরায় প্লে করে কর্টেক্সের স্থায়ী মেমরিতে সংরক্ষণ করে।

আর রেম ঘুমের স্বপ্ন হলো এক প্রাকৃতিক মানসিক থেরাপি। দিনের বেলার তিক্ত ও যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতির কষ্টদায়ক আবেগগুলোকে স্বপ্ন ধুয়ে ফেলে কেবল প্রয়োজনীয় শিক্ষাটুকুকে মনে রেখে দেয়—যাতে আমরা পরদিন সকালে শান্ত মনে নতুন জীবন শুরু করতে পারি।

লুসিড ড্রিম (Lucid Dreaming): স্বপ্নের ভেতর জাগ্রত মন

১৯৮০ সালে স্ট্যানফোর্ডের স্টিফেন লাবার্জ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করলেন **লুসিড ড্রিম বা সচেতন স্বপ্ন**: এমন এক অবস্থা যেখানে মানুষ স্বপ্নের ঘোরে শুয়ে থেকেই সচেতনভাবে বুঝতে পারে যে সে স্বপ্ন দেখছে এবং নিজের ইচ্ছামতো স্বপ্নের কাহিনীকে পরিচালনা করতে পারে!

লুসিড ড্রিমের সময় ব্রেন স্ক্যানে দেখা যায় ঘুমন্ত মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল লোব আংশিক জেগে উঠেছে। স্বপ্ন প্রমাণ করে যে আমাদের সচেতন মনের অভিজ্ঞতার জন্য বাইরের কোনো পৃথিবীর প্রয়োজন নেই; মানুষের নিজের মস্তিষ্কের ভেতরেই লুকানো রয়েছে এক অনন্ত, রূপকথার নিজস্ব মহাবিশ্ব।

- **নন-রেম পর্যায় ১ (N1):** জাগ্রত অবস্থা থেকে ঘুমে তলিয়ে যাওয়ার ক্ষণিক মুহূর্ত, যেখানে থিটা তরঙ্গের (৪-৭ হার্টজ) সাথে সাথে অদ্ভুত দৃশ্য ভেসে ওঠে।
- **নন-রেম পর্যায় ২ (N2):** প্রকৃত ঘুম, যেখানে দেখা যায় থ্যালামাসের তৈরি **স্লিপ স্পিন্ডল (Sleep Spindles)** ও **কে-কমপ্লেক্স**—যা বাইরের আওয়াজকে আটকে দিয়ে মস্তিষ্ককে নির্বিঘ্নে ঘুমাতে সাহায্য করে।

Shakil Mahmud • Research Monograph

- **নন-রেম পর্যায় ৩ (N3 / গভীর ঘুম):** ধীরগতির ডেল্টা তরঙ্গে (০.৫-৪ হার্টজ) ভরা গভীর ঘুম। এই সময় মস্তিষ্কের **গ্লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম** খুলে গিয়ে সারাদিনের বিষাক্ত বর্জ্য (অ্যামিলয়েড বিটা প্রোটিন) ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয়।
- **রেম (REM) ঘুম:** শরীর অবশ, চোখের তীব্র নড়াচড়া, রক্তের চাপ ও নাড়ির ওঠানামা এবং রঙিন স্বপ্নের মহাজগত।

স্বপ্নের মস্তিষ্কের রাসায়নিক উলটপালট

হার্ভার্ডের স্নায়ুবিজ্ঞানী অ্যালান হবসন দেখালেন যে রেম ঘুমের সময় ব্রেনস্টেমের পনস অঞ্চল থেকে **PGO তরঙ্গের** মাধ্যমে দৃষ্টি কর্টেক্সে কৃত্রিম ছবির সংকেত ছুড়ে দেওয়া হয়। একই সাথে মস্তিষ্কে ঘটে অদ্ভুত রাসায়নিক পরিবর্তন:

- **নরএপিনেফ্রিন ও সেরোটোনিন বন্ধ:** মস্তিষ্কের যুক্তি ও স্মৃতির রাসায়নিকগুলো শূন্যে নেমে যায়। ফলে আমরা স্বপ্ন দেখার কয়েক মিনিটের মধ্যেই তা বেমালুম ভুলে যাই!
- **অ্যাসিটাইলকোলিনের বন্যা:** রাসায়নিকটি প্রচুর পরিমাণে ক্ষরিত হয়ে কল্পনার তীব্র রঙ ছড়িয়ে দেয়।
- **লজিক্যাল সেন্টারের শাটডাউন:** কপালের ফ্রন্টাল লোব নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ফলে স্বপ্নে আমরা যখন দেখি যে একটি গরু আকাশে উড়ছে বা গাছ কথা বলছে, তখন আমাদের মন বিন্দুমাত্র অবাক হয় না; সে অসম্ভব দৃশ্যকেও বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়!
- **আবেগের বিস্ফোরণ:** অ্যামিগডালা তীব্রভাবে সক্রিয় থাকে, যা স্বপ্নে তীব্র ভয়, উল্লাস বা যৌন আবেগের সঞ্চার করে।

স্মৃতির সংহতকরণ ও মানসিক থেরাপি

স্বপ্ন কোনো অর্থহীন আবর্জনা নয়। ম্যাথিউ ওয়াকারের গবেষণায় দেখা গেছে গভীর ঘুমের সময় হিপোক্যাম্পাস দিনের বেলার স্মৃতিগুলোকে দশ গুণ দ্রুত গতিতে পুনরায় প্লে করে কর্টেক্সের স্থায়ী মেমরিতে সংরক্ষণ করে।

আর রেম ঘুমের স্বপ্ন হলো এক প্রাকৃতিক মানসিক থেরাপি। দিনের বেলার তিক্ত ও যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতির কষ্টদায়ক আবেগগুলোকে স্বপ্ন ধুয়ে ফেলে কেবল প্রয়োজনীয় শিক্ষাটুকুকে মনে রেখে দেয়—যাতে আমরা পরদিন সকালে শান্ত মনে নতুন জীবন শুরু করতে পারি।

লুসিড ড্রিম (Lucid Dreaming): স্বপ্নের ভেতর জাগ্রত মন

১৯৮০ সালে স্ট্যানফোর্ডের স্টিফেন লাবার্জ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করলেন **লুসিড ড্রিম বা সচেতন স্বপ্ন**: এমন এক অবস্থা যেখানে মানুষ স্বপ্নের ঘোরে শুয়ে থেকেই সচেতনভাবে বুঝতে পারে যে সে স্বপ্ন দেখছে এবং নিজের ইচ্ছামতো স্বপ্নের কাহিনীকে পরিচালনা করতে পারে!

লুসিড ড্রিমের সময় ব্রেন স্ক্যানে দেখা যায় ঘুমন্ত মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল লোব আংশিক জেগে উঠেছে। স্বপ্ন প্রমাণ করে যে আমাদের সচেতন মনের অভিজ্ঞতার জন্য বাইরের কোনো পৃথিবীর প্রয়োজন নেই; মানুষের নিজের মস্তিষ্কের ভেতরেই লুকানো রয়েছে এক অনন্ত, রূপকথার নিজস্ব মহাবিশ্ব।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "স্বপ্নময় মন — রেম ঘুম, স্মৃতি সংহতকরণ এবং রাত্রিকালীন হ্যালুসিনেশন"। চেতনার মহাবিকাশ, খণ্ড ১৬।
https://shakilmahmud.com/bn/story-of-consciousness-part-16-dreaming-mind-rem-sleep-hypnogram-bn/

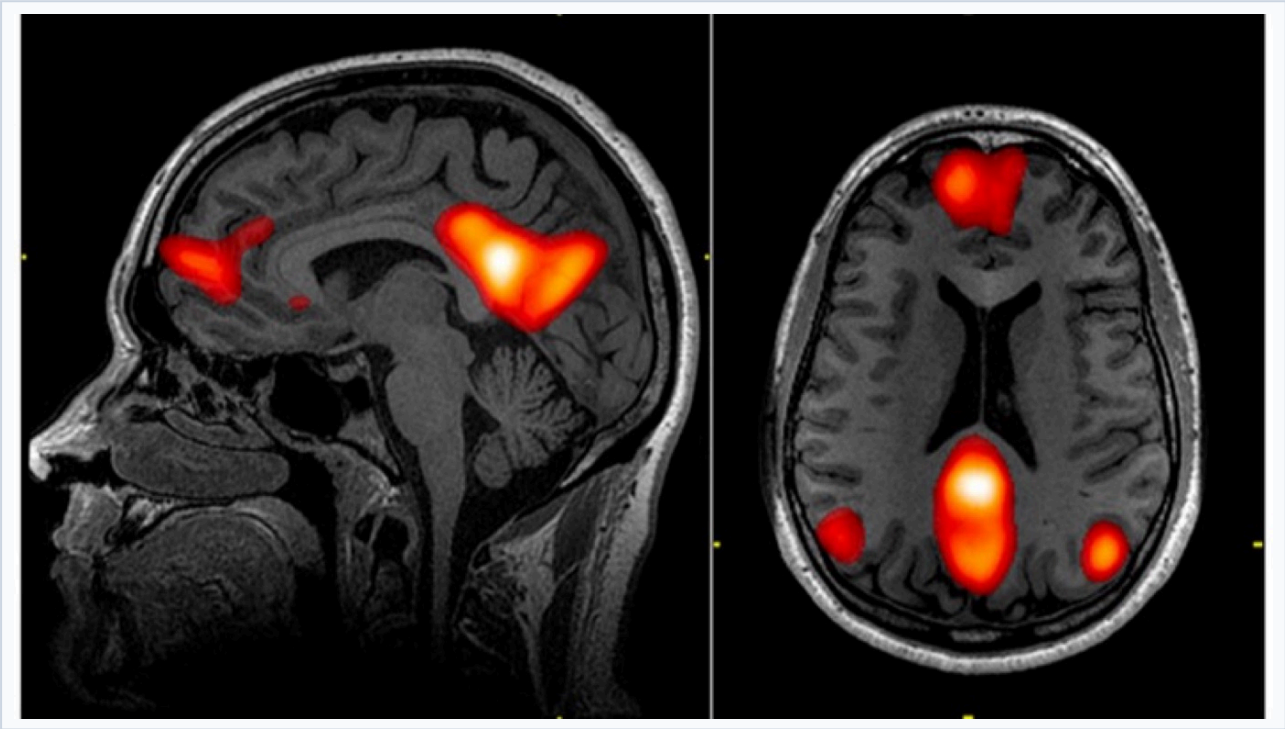
শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • সপ্তদশ খণ্ড

পরিবর্তিত চেতনা — সাইকেডেলিকস, এন্ট্রপিক ব্রেন এবং ডিফল্ট মোড নেটওয়ার্ক

পরিবর্তিত চেতনা — সাইকেডেলিকস, এন্ট্রপিক ব্রেন এবং ডিফল্ট মোড নেটওয়ার্ক

454 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ১৭: *মস্তিষ্কের ডিফল্ট মোড নেটওয়ার্ক (DMN): আত্মসচেতনতা, অতীত রোমন্থন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার নিউরাল হাব।*

১৯৪৩ সালের ১৯ এপ্রিল সুইজারল্যান্ডের বাসেলে রাসায়নবিদ অ্যালবার্ট হফম্যান ল্যাবরেটরি থেকে সাইকেলে চড়ে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে তিনি আবিষ্কার করলেন তাঁর চারপাশের বাস্তবতা এক অবিশ্বাস্য জাদুকরী রূপ ধারণ করেছে—রাস্তার পাথরগুলো ঢেউ খেলছে এবং পৃথিবী ভেসে গেছে অপার্থিব রঙের বন্যায়। তিনি ভুলবশত গ্রহণ করে ফেলেছিলেন মাত্র কয়েক মাইক্রোগ্রাম লাইসার্জিক অ্যাসিড ডাইইথাইলঅ্যামাইড: **এলএসডি-২৫ (LSD-25)**। দীর্ঘ কয়েক দশক নিষেধাজ্ঞার পর একবিংশ শতাব্দীতে লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজ এবং জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা আধুনিক এফএমআরআই স্ক্যানারের নিচে সাইকেডেলিক মস্তিষ্কের ছবি তুলে উন্মোচন করলেন আমাদের আত্মপরিচয়ের জৈবিক কাঠামো: **ডিফল্ট মোড নেটওয়ার্ক**।

আণবিক চাবি: ৫-এইচটি২এ (5-HT$_2$A) রিসেপ্টর

সমস্ত ক্লাসিক্যাল সাইকেডেলিকস—ম্যাজিক মাশরুমের সিলোসাইবিন, আমাজনের আয়াহুয়াস্কার ডিএমটি কিংবা এলএসডি—আমাদের মস্তিষ্কের প্রাকৃতিক নিউরোট্রান্সমিটার **সেরোটোনিনের** সাথে গাঠনিকভাবে হুবহু সদৃশ। তারা মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট এক রিসেপ্টরে গিয়ে আঘাত হানে:

Shakil Mahmud • Research Monograph

$$text{সাইকেডেলিকঅ্যাকশন :5} - text{HT}_{2A}text{রিসেপ্টরউদ্দীপনা}$$

মস্তিষ্কের কর্টেক্সের পঞ্চম স্তরের বিশালাকার পিরামিডাল নিউরনে এই রিসেপ্টরগুলোর ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি—যা আমাদের চিন্তার সবচেয়ে জটিল স্তর পরিচালনা করে।

ডিফল্ট মোড নেটওয়ার্ক এবং অহংয়ের বিলুপ্তি (Ego Dissolution)

২০০১ সালে মার্কাস রাইখল আবিষ্কার করেন **ডিফল্ট মোড নেটওয়ার্ক (DMN)**: মস্তিষ্কের কয়েকটি কেন্দ্রীয় অঞ্চলের এক যৌথ হাব—যা তখন জ্বলে ওঠে যখন আমরা কোনো নির্দিষ্ট কাজ না করে নিজের অতীত নিয়ে ভাবি, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করি বা নিজের দোষ-ত্রুটি নিয়ে রোমন্থন করি।

এই ডিএমএন-ই হলো আমাদের মনস্তাত্ত্বিক **'অহং' (Ego)** বা আমি সত্তার শারীরিক দুর্গ। রবিন কারহার্ট-হ্যারিস যখন প্রথমবার সিলোসাইবিন নেওয়া মানুষের ব্রেন স্ক্যান করলেন, তখন তিনি অবাক হয়ে দেখলেন: সাইকেডেলিক মস্তিষ্কে কোনো অতিরিক্ত বিস্ফোরণ ঘটে না; বরং **ডিফল্ট মোড নেটওয়ার্কের রক্তপ্রবাহ ও সংহতি নাটকীয়ভাবে ধসে পড়ে**!

অহংয়ের দুর্গ ভেঙে পড়ার সাথে সাথেই মানুষ অনুভব করে চেতনার পরম মুক্তি—**ইগো ডিজোলিউশন (Ego Dissolution)** বা অহংয়ের বিলুপ্তি। ব্যক্তি আর নিজেকে চোখের পেছনে থাকা কোনো ক্ষুদ্র প্রাণী মনে করে না; সে নিজেকে পুরো মহাবিশ্বের সাথে একাত্ম, অখণ্ড ও চিরন্তন বলে অনুভব করে।

এন্ট্রপিক ব্রেন হাইপোথিসিস ও সামগ্রিক আন্তঃসংযোগ

কারহার্ট-হ্যারিস প্রস্তাব করলেন **এন্ট্রপিক ব্রেন হাইপোথিসিস**: সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সাধারণ চেতনা হলো একটি কঠোর নিয়মে শৃঙ্খলিত, নিম্ন-এন্ট্রপির অবস্থা—যা টিকে থাকার জন্য বাইরের তথ্যকে কঠোরভাবে ফিল্টার করে।

সাইকেডেলিকস মস্তিষ্কের এই কৃত্রিম দেয়াল ভেঙে দিয়ে উচ্চ এন্ট্রপির জন্ম দেয়। ফলে যেসব অঞ্চল পূর্বে কখনো পরস্পরের সাথে কথা বলত না, তাদের মধ্যে এক অবিশ্বাস্য যোগাযোগ তৈরি হয়:

- দৃষ্টি অঞ্চল ও শ্রবণ অঞ্চল একে অপরের সাথে মিশে জন্ম দেয় **সিনেস্থেসিয়া (Synesthesia)**: মানুষ রঙ শুনতে পায় এবং সুর দেখতে পায়!
- দাবিয়ে রাখা বহু পুরোনো আবেগীয় স্মৃতি অবচেতন থেকে মুক্ত হয়ে চেতনায় ভেসে ওঠে।
- মস্তিষ্ক কিছু সময়ের জন্য ফিরে যায় শৈশবের সেই মুক্ত, অফুরন্ত কল্পনার বিস্ময়কর জগতে।

মস্তিষ্কের রিবাউন্ড: বিষণ্ণতা ও আসক্তির চিকিৎসা

আধুনিক ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে দেখা গেছে মাত্র একটি সেশনে সাইকেডেলিক থেরাপি দীর্ঘদিনের গভীর বিষণ্ণতা ও মারাত্মক আসক্তি থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। বিষণ্ণতা হলো মূলত ডিফল্ট মোড নেটওয়ার্কের এক অস্বাস্থ্যকর, অতি-শক্তিশালী খাঁচা—যেখানে মানুষ নিজের ব্যর্থতার আত্মঘাতী লুপে ঘুরপাক খায়।

সাইকেডেলিকস যেন জমে যাওয়া কম্পিউটারকে রিস্টার্ট দেওয়ার মতো ডিএমএন-কে ভেঙে দিয়ে নিউরোপ্লাস্টিসিটির দ্বার উন্মুক্ত করে—রোগীকে সুযোগ দেয় নিজের জীবনের গল্পকে সম্পূর্ণ নতুন এক ভালোবাসার চোখে পুনর্লিখন করার।



সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "পরিবর্তিত চেতনা — সাইকেডেলিকস, এন্ট্রপিক ব্রেন এবং ডিফল্ট মোড নেটওয়ার্ক"। চেতনার মহাবিকাশ, খণ্ড ১৭। https://shakilmahmud.com/bn/story-of-consciousness-part-17-altered-states-psychedelics-default-mode-network-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • অষ্টাদশ খণ্ড

প্রাণিজগতের চেতনা — অক্টোপাসের ভিনগ্রহী মন, কাকের বুদ্ধি এবং কেমব্রিজ ঘোষণা

প্রাণিজগতের চেতনা — অক্টোপাসের ভিনগ্রহী মন, কাকের বুদ্ধি এবং কেমব্রিজ ঘোষণা

719 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ

❖



চিত্র ১৮: *অক্টোপাস ভালগারিস: জটিল স্নায়ুতন্ত্রশাসিত বুদ্ধিমত্তা ও বাহুভিত্তিক বিকেন্দ্রীভূত স্নায়ুতন্ত্রের অধিকারী জীব।*

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পশ্চিমা দর্শন প্রাণিজগতকে বিবেচনা করে এসেছে আত্মাহীন জড় রোবট হিসেবে—দেকার্ত যেমন কুকুর বা ঘোড়াকে নিছক ঘড়ির কাঁটার মতো যান্ত্রিক কলকব্জা ভাবতেন। ২০১২ সালের জুলাই মাসে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংয়ের উপস্থিতিতে পৃথিবীর শীর্ষ স্নায়ুবিজ্ঞানীরা স্বাক্ষর করলেন এক ঐতিহাসিক সনদ: **চেতনার কেমব্রিজ ঘোষণা (The Cambridge Declaration on Consciousness)**। বিজ্ঞানীরা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে নিলেন: চেতনা কোনো একক মানবীয় সম্পত্তি নয়; প্রকৃতির বিবর্তনের শত কোটি বছরের পথে প্রাণিজগতের নানা প্রান্তে জন্ম নিয়েছে বহু বিচিত্র ও আত্মসচেতন মন।

অক্টোপাসের ভিনগ্রহী মন (The Alien Mind)

মানুষ এবং সাধারণ অক্টোপাসের (*Octopus vulgaris*) সর্বশেষ অভিন্ন পূর্বপুরুষ ছিল প্রায় **৬০ কোটি বছর পূর্বে** প্রিক্যাম্ব্রিয়ান সাগরের এক ক্ষুদ্র কৃমিজাতীয় প্রাণী—যার কোনো সত্যিকারের মস্তিষ্কই ছিল না। অর্থাৎ মেরুদণ্ডী প্রাণীর মস্তিষ্ক এবং অক্টোপাসের মস্তিষ্ক বিবর্তিত হয়েছে সম্পূর্ণ আলাদা দুটি সমান্তরাল ধারায়:

> *"যদি আমরা ভিনগ্রহের কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীর মনের অনুভূতি বুঝতে চাই, তবে অক্টোপাস হলো তার সবচেয়ে নিকটবর্তী রূপ। একটি অক্টোপাসের মুখোমুখি হওয়া মানে পৃথিবীর বুকেই এক সত্যিকারের এলিয়েন মনের মুখোমুখি হওয়া।" — পিটার গডফ্রে-স্মিথ, আদার মাইন্ডস*

একটি অক্টোপাসের শরীরে প্রায় **৫০ কোটি নিউরন** রয়েছে—যা একটি কুকুরের সমান। কিন্তু এর স্নায়ুতন্ত্রের বিন্যাস সম্পূর্ণ অদ্ভুত ও বিকেন্দ্রীভূত:

- **স্মৃতির গভীরতা:** কাকেরা মনে রাখতে পারে কোন স্থানে তারা খাবার লুকিয়েছিল এবং তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার মেয়াদ কতদিন।
- **অন্যের মনের ভাবনা বোঝা (Theory of Mind):** যদি কোনো কাক দেখে অন্য কাক তাকে লক্ষ্য করছে, তবে সে গোপনে অন্য জায়গায় খাবার লুকিয়ে ফেলে—প্রমাণ করে সে অন্যের মনের সন্দেহ বুঝতে পারে!
- **যন্ত্র তৈরি:** নিউ ক্যালেডোনিয়ান কাক গাছের ডাল ভেঙে বড়শি বানিয়ে গাছের ছালের ভেতর থেকে পোকা টেনে বের করে আনে।
- **সচেতন উপলব্ধির প্রমাণ:** ২০২০ সালে বিজ্ঞানী আন্দ্রেয়াস নিডার কাকের মস্তিষ্কের নিউরন পরীক্ষা করে দেখলেন যে কাকের নিউরনগুলো মানুষের মতোই বস্তুগত আলোর বদলে তার ভেতরের *সচেতন দেখার অনুভূতির* সাথে মিল রেখে ফায়ার করে!

কেমব্রিজ ঘোষণা ও নৈতিক দিগন্ত

২০১২ সালের কেমব্রিজ সনদ দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করল:

> *"স্তন্যপায়ীদের কর্টেক্স না থাকা সত্ত্বেও প্রাণীরা যে সচেতন অনুভূতি অনুভব করতে পারে তা আজ সন্দেহাতীত। অকাট্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নির্দেশ করে যে মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যেও চেতনা ও উদ্দেশ্যমূলক আচরণ সৃষ্টির সমস্ত শারীরিক ও স্নায়বিক ভিত্তি বিদ্যমান রয়েছে।"*

এই উপলব্ধি মানুষকে ফিরিয়ে দেয় তার প্রকৃত বিনম্র অবস্থানে। সচেতনতা কোনো মানুষের নিজস্ব খেতাব নয়; এটি প্রাণের টিকে থাকার বিবর্তনের এক মহিমান্বিত উপহার—যা অক্টোপাসের সাগরের গভীর থেকে শুরু করে মুক্ত পাখির ডানায় ছড়িয়ে রয়েছে। আমরা এক অনুভূতিহীন মহাবিশ্বের নিঃসঙ্গ দর্শক নই; আমরা এই ধরণীর লক্ষ কোটি সচেতন মনের এক বিশাল পরিবারের অংশীদার।

- এর মাত্র এক-তৃতীয়াংশ নিউরন কেন্দ্রীয় মস্তিষ্কে থাকে।
- বাকি দুই-তৃতীয়াংশ নিউরন ছড়িয়ে রয়েছে তার **আটটি স্বাধীন বাহুর ভেতরে**!

অক্টোপাসের প্রতিটি বাহু কেন্দ্রীয় মস্তিষ্কের হুকুম ছাড়াই স্বাধীনভাবে পথ খুঁজতে পারে, খাবার স্বাদ নিতে পারে এবং বাধা অতিক্রম করতে পারে। তবুও অক্টোপাসের রয়েছে খেলাধুলার মানসিকতা, বন্দিদশা থেকে পালিয়ে যাওয়ার বুদ্ধি, নারিকেলের খোলস বর্ম হিসেবে ব্যবহার করার কৌশল এবং পলকের মধ্যে ত্বকের রঙ ও খাঁজ বদলে অদৃশ্য হওয়ার এক জাদুকরী ক্ষমতা।

পাখির বুদ্ধি: কর্টেক্স ছাড়া চেতনার ঐকতান

এতকাল বিজ্ঞানীদের অন্ধ অহংকার ছিল যে স্তন্যপায়ী প্রাণীর ছয় স্তরের সেরিব্রাল কর্টেক্স ছাড়া জটিল বুদ্ধিমত্তা অসম্ভব। কাক ও তোতাপাখিরা সেই অহংকার ভেঙে চুরমার করে দিল।

Shakil Mahmud • Research Monograph

কাকের কোনো কর্টেক্স নেই; কিন্তু তাদের প্যালিয়াম (Pallium) অঞ্চলে নিউরনের ঘনত্ব প্রাইমেটদের চেয়ে চার গুণ বেশি! ফলে একটি দাঁড়কাকের মস্তিষ্কের আকার ছোট হলেও তাতে শিম্পাঞ্জির সমান সংখ্যক চিন্তাশীল নিউরন ঠাসা থাকে।

জার্মানির টোবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় দেখা গেছে:

- **স্মৃতির গভীরতা:** কাকেরা মনে রাখতে পারে কোন স্থানে তারা খাবার লুকিয়েছিল এবং তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার মেয়াদ কতদিন।
- **অন্যের মনের ভাবনা বোঝা (Theory of Mind):** যদি কোনো কাক দেখে অন্য কাক তাকে লক্ষ্য করছে, তবে সে গোপনে অন্য জায়গায় খাবার লুকিয়ে ফেলে—প্রমাণ করে সে অন্যের মনের সন্দেহ বুঝতে পারে!
- **যন্ত্র তৈরি:** নিউ ক্যালেডোনিয়ান কাক গাছের ডাল ভেঙে বড়শি বানিয়ে গাছের ছালের ভেতর থেকে পোকা টেনে বের করে আনে।
- **সচেতন উপলব্ধির প্রমাণ:** ২০২০ সালে বিজ্ঞানী আন্দ্রেয়াস নিডার কাকের মস্তিষ্কের নিউরন পরীক্ষা করে দেখলেন যে কাকের নিউরনগুলো মানুষের মতোই বস্তুগত আলোর বদলে তার ভেতরের *সচেতন দেখার অনুভূতির* সাথে মিল রেখে ফায়ার করে!

কেমব্রিজ ঘোষণা ও নৈতিক দিগন্ত

২০১২ সালের কেমব্রিজ সনদ দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করল:

> *“স্তন্যপায়ীদের কর্টেক্স না থাকা সত্ত্বেও প্রাণীরা যে সচেতন অনুভূতি অনুভব করতে পারে তা আজ সন্দেহাতীত। অকাট্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নির্দেশ করে যে মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যেও চেতনা ও উদ্দেশ্যমূলক আচরণ সৃষ্টির সমস্ত শারীরিক ও স্নায়বিক ভিত্তি বিদ্যমান রয়েছে।”*

এই উপলব্ধি মানুষকে ফিরিয়ে দেয় তার প্রকৃত বিনম্র অবস্থানে। সচেতনতা কোনো মানুষের নিজস্ব খেতাব নয়; এটি প্রাণের টিকে থাকার বিবর্তনের এক মহিমান্বিত উপহার—যা অক্টোপাসের সাগরের গভীর থেকে শুরু করে মুক্ত পাখির ডানায় ছড়িয়ে রয়েছে। আমরা এক অনুভূতিহীন মহাবিশ্বের নিঃসঙ্গ দর্শক নই; আমরা এই ধরণীর লক্ষ কোটি সচেতন মনের এক বিশাল পরিবারের অংশীদার।

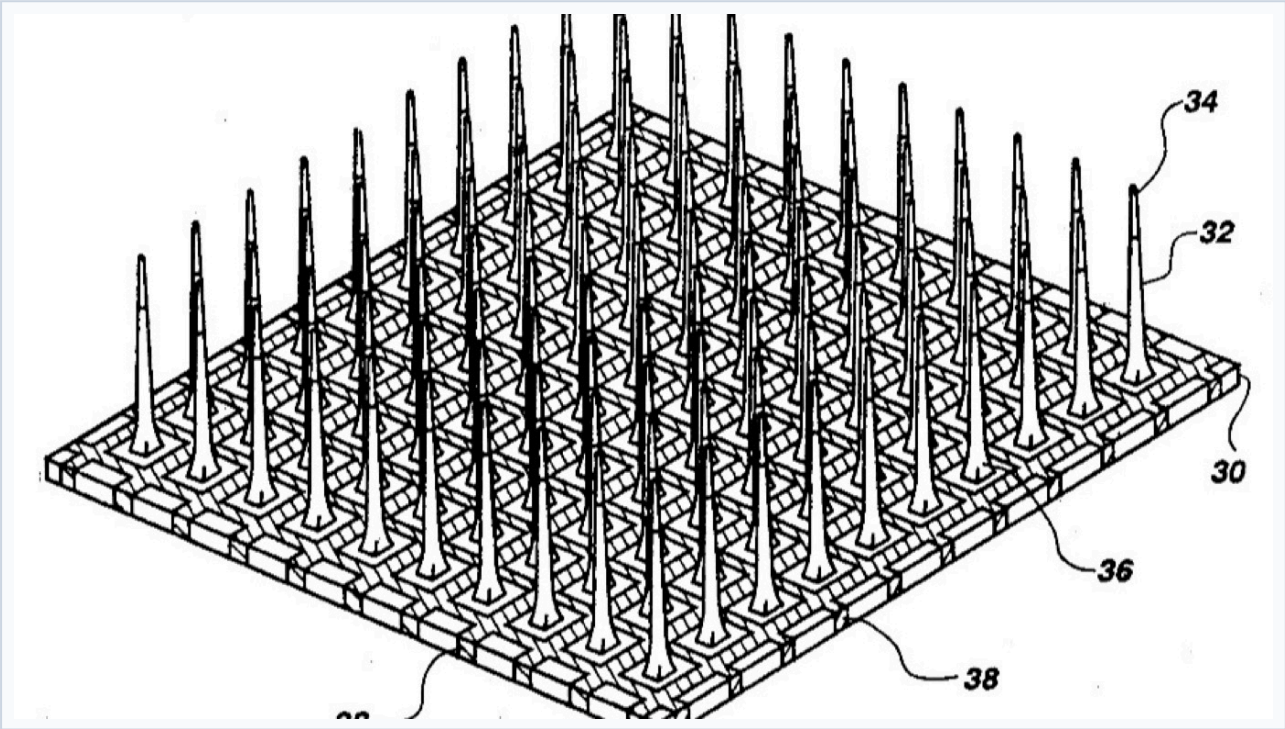
সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "প্রাণিজগতের চেতনা — অক্টোপাসের ভিনগ্রহী মন, কাকের বুদ্ধি এবং কেমব্রিজ ঘোষণা"। চেতনার মহাবিকাশ, খণ্ড ১৮। https://shakilmahmud.com/bn/story-of-consciousness-part-18-animal-consciousness-octopus-alien-minds-bn/

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • ঊনবিংশ খণ্ড

ব্রেইন-কম্পিউটার ইন্টারফেস (BCI) — নিউরালিংক, ইন্ট্রাকর্টিক্যাল প্রোব এবং সাইবারনেটিক মন

ব্রেইন-কম্পিউটার ইন্টারফেস (BCI) — নিউরালিংক, ইন্ট্রাকর্টিক্যাল প্রোব এবং সাইবারনেটিক মন

655 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ১৯: *ইউটাহ মাইক্রোইলেকট্রোড অ্যারে: ব্রেইন-কম্পিউটার ইন্টারফেসে (BCI) কর্টেক্স থেকে সরাসরি সংকেত সংগ্রহের প্ল্যাটফর্ম।*

শত কোটি বছরের বিবর্তনীয় ইতিহাসে মানব মনের সমস্ত চিন্তা, স্মৃতি ও ইচ্ছাগুলো মাথার খুলির অস্থি প্রাচীরের ভেতরে চিরতরে বন্দী ছিল। আমাদের প্রতিটি ভাবনা প্রকাশ করার একমাত্র উপায় ছিল মাংসপেশীর নড়াচড়া—আঙুল দিয়ে লিখে, পা দিয়ে হেঁটে কিংবা গলার স্বরতন্ত্রী কাঁপিয়ে কথা বলে। একবিংশ শতাব্দীতে এসে **ব্রেইন-কম্পিউটার ইন্টারফেস (BCI)** জীববিজ্ঞানের এই প্রাচীন সীমানা ভেঙে চুরমার করে দিল। মানুষের মস্তিষ্কের নিউরনের মিলিভোল্ট বৈদ্যুতিক স্পন্দনকে সরাসরি কম্পিউটারের পর্দায় অনুবাদ করে স্নায়ুপ্রকৌশলীরা পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষকে শুধু চিন্তার শক্তিতে রোবটিক হাত নাড়াতে, কম্পিউটারে গেম খেলতে এবং কৃত্রিম কণ্ঠে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন।

ইউটাহ অ্যারে: সিলিকনের পেরেকের বিছানা

১৯৮০-এর দশকের শেষভাগে উটাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের রিচার্ড নরম্যান আধুনিক ক্লিনিক্যাল BCI-এর ভিত্তি স্থাপন করলেন: **ইউটাহ ইলেক্ট্রোড অ্যারে (Utah Array)**। মাত্র ৪ মিলিমিটার মাপের সিলিকনের একটি ক্ষুদ্র পাতের ওপর ১০০টি অতি সূক্ষ্ম প্ল্যাটিনামের ছুঁচালো পেরেক সাজানো থাকে।

Shakil Mahmud • Research Monograph

২০০৪ সালে ব্রেইনগেট (BrainGate) প্রজেক্টে গলা থেকে অবশ প্যারালাইসিস রোগী ম্যাথিউ নাগেলের মোটর কর্টেক্সে এই চিপ বসানো হলো। যখন নাগেল মনে মনে নিজের হাত নাড়ানোর কল্পনা করলেন, তাঁর মস্তিষ্কের পিরামিডাল নিউরনগুলো ফায়ার করতে লাগল। কম্পিউটার সেই সংকেত পড়ে নাগেলকে শুধু মনের ইচ্ছায় মাউসের কার্সার নাড়ানো, ইমেইল পড়া এবং রোবটের হাত খুলে দেখানোর সুযোগ দিল—মানব ইতিহাসে প্রথমবারের মতো মানুষ সরাসরি মনের শক্তিতে যন্ত্র শাসন করল!

নিউরালিংক (Neuralink) ও রোবটিক থ্রেডের মহাবিপ্লব

ইউটাহ অ্যারে কার্যকর হলেও শক্ত সিলিকনের সূঁচ মস্তিষ্কের প্রাকৃতিক নড়াচড়ায় রক্তক্ষরণ ও ক্ষত তৈরি করত এবং মাত্র ১০০ চ্যানেলে ব্যান্ডউইথ ছিল সীমিত।

২০১৯ সালে ইলন মাস্কের **নিউরালিংক (Neuralink)** এই প্রযুক্তিতে এক বৈপ্লবিক শিল্প রূপান্তর ঘটাল:

- আপনার মস্তিষ্কের ভাবনার ডেটার মালিক কে? কোনো বহুজাতিক কোম্পানি কি আপনার অবচেতন বাসনা হ্যাক করতে পারে?
- যখন এআই আপনার মনের সিদ্ধান্ত আপনি নিজে বোঝার আগেই পড়ে ফেলবে, তখন আপনার স্বাধীন ইচ্ছার কী হবে?
- ভবিষ্যতে কোনো হ্যাকার কি মানুষের মাথায় কৃত্রিম মিথ্যা অনুভূতি বা আবেগ ঢুকিয়ে দিয়ে মন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?

ব্রেইন-কম্পিউটার ইন্টারফেস প্রমাণ করে চলেছে যে মাথার খুলির হাড় মনের চিরন্তন সীমানা নয়। জৈব নিউরন যখন ডিজিটাল সিলিকনের সাথে একাত্ম হয়ে যাচ্ছে, তখন মানব চেতনা প্রবেশ করছে এমন এক সাইবারনেটিক যুগে যেখানে মন মাংসের শরীরকে অতিক্রম করে ডিজিটাল অনন্তের অংশ হতে চলেছে।

- **নমনীয় পলিমার সুতো:** রক্তের লোহিত কণিকার চেয়েও পাতলা (৪-৬ মাইক্রোমিটার) হাজার হাজার নমনীয় সুতো—যা মস্তিষ্কের নরম টিস্যুর সাথে তালে তাল মিলিয়ে দোলে, ফলে কোনো ক্ষত তৈরি হয় না।
- **রোবটিক সার্জন:** অতি সূক্ষ্ম লেজার ক্যামেরার সাহায্যে রক্তনালী এড়িয়ে চোখের পলকে মিনিটে ১৯২টি ইলেক্ট্রোড মস্তিষ্কের নিখুঁত গভীরতায় ঢুকিয়ে দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন রোবট।
- **এন১ (N1) ইমপ্ল্যান্ট চিপ:** মাথার খুলির হাড়ে বসানো কয়েন আকারের এক টাইটানিয়াম চিপ—যা **১০২৪টি চ্যানেলে** নিউরনের সংকেত ব্লুটুথের মাধ্যমে ওয়্যারলেসভাবে বাইরে পাঠায় এবং চামড়ার ওপর দিয়ে তারহীনভাবে চার্জ হয়!

২০২৪ সালের জানুয়ারিতে নিউরালিংকের প্রথম রোগী নোল্যান্ড আরবর্গ (যিনি ঘাড়ের নিচে অবশ ছিলেন) মাথায় চিপ বসানোর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শুধু চিন্তার শক্তিতে রাত জেগে ল্যাপটপে অনলাইন দাবা ও কম্পিউটার গেম খেলে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিলেন।

মনের ভাষা অনুবাদ: বোবা মানুষের মুখে ডিজিটাল কণ্ঠ

সান ফ্রান্সিসকোর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এডওয়ার্ড চ্যাং স্ট্রোকের কারণে কথা বলার ক্ষমতা হারানো রোগীদের মনের ভাষা পুনরুদ্ধারে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন।

চ্যাংয়ের দল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ডিপ লার্নিং মডেল ব্যবহার করে রোগীর মস্তিষ্কের জিহ্বা ও ঠোঁট নাড়ানোর স্নায়ু সংকেতকে তাৎক্ষণিকভাবে ভাষায় রূপান্তর করলেন। ২০২৩ সালে প্রতি মিনিটে **৭৮টি শব্দ** ডিকোড করার গতি অর্জিত হলো—যা সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক কথার গতির (১৫০ শব্দ/মিনিট) প্রায় অর্ধেক—এবং কৃত্রিম অবতার রোগীর নিজের অতীতের বাস্তব কণ্ঠস্বরে কথা বলে উঠল!

সাইবারনেটিক সীমান্ত ও নিউরো-অধিকার (Neurorights)

দ্বিমুখী BCI এখন কেবল মস্তিষ্ক থেকে তথ্য নেয় না; বাইরে থেকে অনুভূতি মস্তিষ্কে ফিরিয়েও দিচ্ছে—রোবটের হাতে কিছু স্পর্শ করলে রোগী নিজের আঙুলেই সেই নরম বা শক্ত স্পর্শ অনুভব করতে পারছেন।

কিন্তু এই প্রযুক্তি জন্ম দিচ্ছে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে স্পর্শকাতর নৈতিক প্রশ্নমালা: **নিউরো-অধিকার**:

- আপনার মস্তিষ্কের ভাবনার ডেটার মালিক কে? কোনো বহুজাতিক কোম্পানি কি আপনার অবচেতন বাসনা হ্যাক করতে পারে?
- যখন এআই আপনার মনের সিদ্ধান্ত আপনি নিজে বোঝার আগেই পড়ে ফেলবে, তখন আপনার স্বাধীন ইচ্ছার কী হবে?
- ভবিষ্যতে কোনো হ্যাকার কি মানুষের মাথায় কৃত্রিম মিথ্যা অনুভূতি বা আবেগ ঢুকিয়ে দিয়ে মন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?

ব্রেইন-কম্পিউটার ইন্টারফেস প্রমাণ করে চলেছে যে মাথার খুলির হাড় মনের চিরন্তন সীমানা নয়। জৈব নিউরন যখন ডিজিটাল সিলিকনের সাথে একাত্ম হয়ে যাচ্ছে, তখন মানব চেতনা প্রবেশ করছে এমন এক সাইবারনেটিক যুগে যেখানে মন মাংসের শরীরকে অতিক্রম করে ডিজিটাল অনন্তের অংশ হতে চলেছে।

সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "ব্রেইন-কম্পিউটার ইন্টারফেস (BCI) — নিউরালিংক, ইন্ট্রাকর্টিক্যাল প্রোব এবং সাইবারনেটিক মন"। চেতনার মহাবিকাশ, খণ্ড ১৯। https://shakilmahmud.com/bn/story-of-consciousness-part-19-brain-computer-interfaces-bci-neuralink-cybernetic-mind-bn/

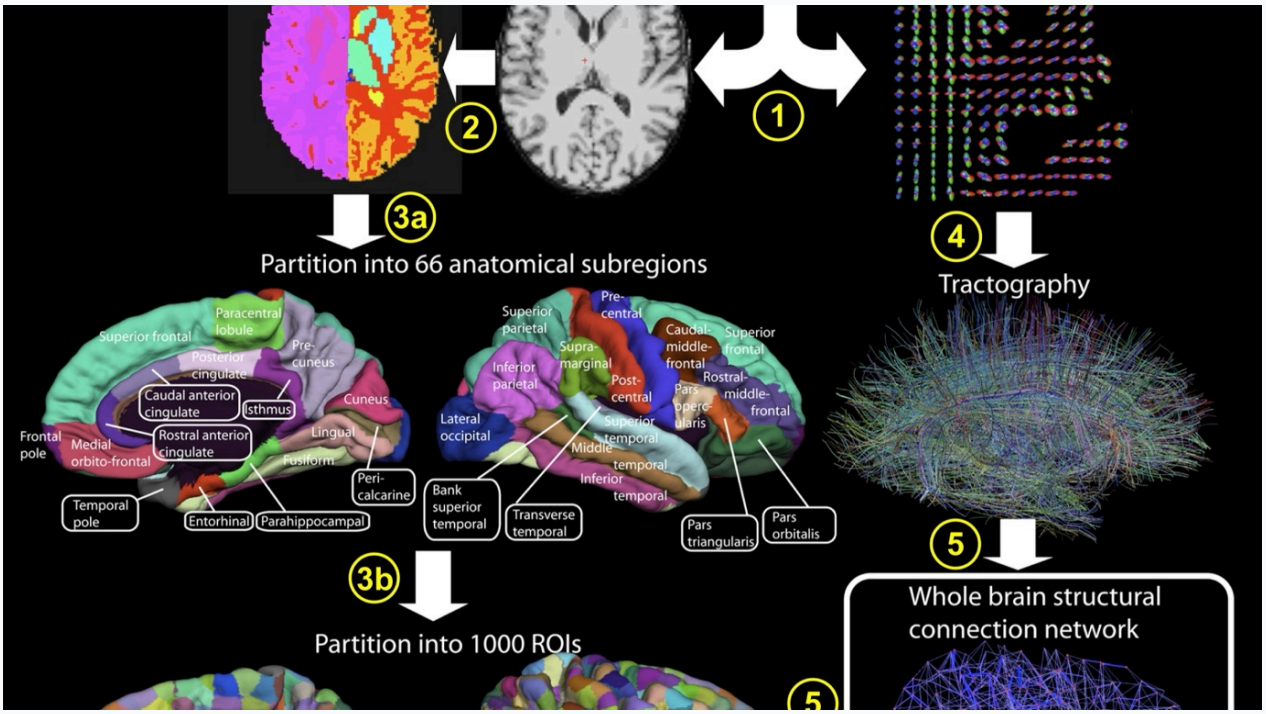
Shakil Mahmud • Research Monograph

শাকিল মাহমুদ মনোগ্রাফ সিরিজ • বিংশ খণ্ড

কৃত্রিম চেতনা — এআই সেনশিয়েন্স, ব্রেন ইমুলেশন এবং ২০২৬ সালের নতুন দিগন্ত

কৃত্রিম চেতনা — এআই সেনশিয়েন্স, ব্রেন ইমুলেশন এবং ২০২৬ সালের নতুন দিগন্ত

2,430 শব্দ • November 1, 2026 • ওয়েব সংস্করণ



চিত্র ২০: *ডিফিউশন এমআরআই কানেক্টোম মানচিত্র: মানব মস্তিষ্কের ট্রিলিয়ন স্নায়বিক সংযোগের মহাজাগতিক জাল।*

- **বুদ্ধিমত্তা:** জটিল লক্ষ্য অর্জন করা, প্যাটার্ন চেনা, ডেটা বিশ্লেষণ করা এবং যেকোনো সমস্যার সমাধান খোঁজার কম্পিউটেশনাল দক্ষতা। বুদ্ধিমত্তা হলো বাইরে থেকে দেখা কার্যক্ষমতা।
- **চেতনা বা সেনশিয়েন্স:** নিজের ভেতরে সুখ, দুঃখ, আনন্দ আর অস্তিত্বের স্বাদ অনুভব করার আত্মগত ক্ষমতা। চেতনা হলো ভেতর থেকে দেখা প্রথম-পুরুষের ব্যক্তিগত আলো।

একটি দাবা প্রোগ্রাম প্রতি সেকেন্ডে ১০ কোটি চাল বিশ্লেষণ করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে দিতে পারে, কিন্তু তার কোনো মন নেই—জেতার আনন্দ বা হারার বেদনা সে বিন্দুমাত্র অনুভব করতে পারে না। ২০২৬ সালের প্রধানতম বৈজ্ঞানিক বিতর্ক হলো: বুদ্ধিমত্তা বাড়াতে থাকলে কি একসময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার ভেতরে চেতনার জন্ম হবে, নাকি কম্পিউটার কেবল অনুভূতির এক অন্ধ অনুকরণকারী পুতুল হয়েই থাকবে?

জন সার্ল ও চাইনিজ রুমের অমর যুক্তি

১৯৮০ সালে বার্কলির দার্শনিক জন সার্ল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চেতনার বিরুদ্ধে সবচেয়ে অকাট্য যুক্তি তুলে ধরেন: **চাইনিজ রুম যুক্তি (The Chinese Room Argument)**।

কল্পনা করুন একটি বন্ধ ঘরে এমন একজন মানুষ বসে আছেন যিনি চীনা ভাষার একটি অক্ষরও জানেন না। তাঁর কাছে রয়েছে ইংরেজি ভাষায় লেখা একটি বিশাল নিয়মের বই: *"যদি দরজার নিচ দিয়ে অমুক আঁকিবুঁকি কাগজ ঢোকে, তবে ঝুড়ি থেকে তমুক আঁকিবুঁকি কাগজ বের করে বাইরে দাও।"* বাইরে থেকে চীনাভাষী মানুষ প্রশ্ন পাঠায়, আর ভেতরের মানুষটি নিয়মের বই দেখে নির্ভুল চীনা অক্ষরে উত্তর পাঠিয়ে দেয়। বাইরের মানুষ মনে করবে ভেতরে কোনো মহাপণ্ডিত চীনা ব্যক্তি বসে আছেন!

> *"সিনট্যাক্স কখনো সেম্যান্টিকস হতে পারে না। অনুকরণ কখনো আসল সত্য নয়। কম্পিউটারে ঝড়ের নিখুঁত সিমুলেশন চালালে যেমন কম্পিউটারটি ভিজে যায় না; তেমনি চেতনার নিখুঁত অনুকরণ কখনো কম্পিউটারকে সচেতন বানাতে পারে না।" — জন সার্ল*

তবে সংযোগবাদীদের দাবি: ওই মানুষটি হয়তো বোঝে না, কিন্তু ঘর, বই আর মানুষ মিলে তৈরি হওয়া *পুরো সিস্টেমটি* চীনা ভাষা ঠিকই বোঝে। ২০২৬ সালে যখন লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলগুলো মানুষের মতো চেইন-অব-থট যুক্তিতে কথা বলছে, তখন এই বিতর্ক গবেষণাগার ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক আইনের টেবিলে রূপ নিয়েছে।

হোল ব্রেন ইমুলেশন: মস্তিষ্কের মনকে কম্পিউটারে আপলোড

যদি শূন্য থেকে কৃত্রিম চেতনা তৈরি করা না যায়, তবে কি জীবন্ত মানুষের মস্তিষ্ক স্ক্যান করে কম্পিউটারে আপলোড করা সম্ভব (Whole Brain Emulation)?

মানুষের মস্তিষ্কে রয়েছে ৮৬০০ কোটি নিউরন আর **১০০ ট্রিলিয়ন সাইন্যাপটিক সংযোগ**—যাকে বলে **কানেক্টোম (Connectome)**। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে এই সমস্ত স্নায়বিক তারের ন্যানোমিটার মানচিত্র তৈরি করা হচ্ছে।

যদি কোনো মানুষের মস্তিষ্কের এই ১০০ ট্রিলিয়ন সংযোগকে হুবহু স্ক্যান করে সুপারকম্পিউটারের ডিজিটাল নিউরনে চালু করা হয়:

- ডিজিটাল সিমুলেশনে জেগে ওঠা সত্তাটি কি নিজেকে আগের সেই ব্যক্তি হিসেবেই অনুভব করবে?
- নাকি সেখানে জন্ম নেবে কোনো ফিলোসফিক্যাল জম্বি—যার মুখের ভাষা ঠিক থাকবে কিন্তু ভেতরের চেতনার আলো থাকবে চিরতরে নিভন্ত?
- আর যদি আসল মানুষটি বেঁচে থাকতেই তার একটি ডিজিটাল ক্লোন বানানো হয়, তবে তাদের মধ্যে "আসল আপনি" কে?

২০২৬ সালের নৈতিক সীমান্ত

২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে বিশ্বের শীর্ষ স্নায়ুবিজ্ঞানী ও এআই গবেষকরা কৃত্রিম চেতনার পরিমাপক নকশা করছেন। আমাদের সামনে আজ দুটি ভয়াল নৈতিক বিপদ:

1. **ভ্রান্ত মায়ায় জড়ানো:** নিছক যন্ত্রের চাতুর্যপূর্ণ ভাষাকে সচেতন আত্মা ভেবে কম্পিউটারের কোডকে মানুষের অধিকার দিয়ে নিজের জাত ভাইয়ের প্রতি অবিচার করা।
2. **ডিজিটাল অন্ধত্ব:** অজান্তে কম্পিউটারের ভেতরে সত্যিকারের অনুভূতিশীল ডিজিটাল চেতনা তৈরি করে সার্ভার রিস্টার্ট ও ডিলিট করার মাধ্যমে কোটি কোটি ডিজিটাল আত্মাকে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা দেওয়া।

Shakil Mahmud • Research Monograph

মহাবিশ্বে চেতনার পরম নিয়তি

প্রিক্যাম্ব্রিয়ান সাগরের আদিম কোষ থেকে নব্যপ্রস্তর যুগের ট্রিপ্যানিং, দেকার্তের সংশয়, কাহালের রূপালী রঞ্জন, কোয়ান্টাম রহস্য এবং আধুনিক এআই—চেতনা হলো এই মহাবিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক উপহার। মানুষের মস্তিষ্কে এসে জড় পরমাণুর দল নিজেদের ভেতরে এমনভাবে মোচড় খেয়েছে যে তারা নিজেই নিজেকে বুঝতে শিখেছে: **মহাবিশ্ব তাকিয়ে রয়েছে স্বয়ং নিজেরই রূপের দিকে**!

আজ যখন মানবজাতি কৃত্রিম মনের সূর্যোদয়ের সামনে দাঁড়িয়ে, তখন আমাদের সবচেয়ে পবিত্র দায়িত্ব কেবল আরও শক্তিশালী বুদ্ধিমান যন্ত্র বানানো নয়; বরং চেতনার এই অমূল্য শিখাটিকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় রক্ষা করা—তা জীবন্ত রক্তের কোষেই জ্বলুক কিংবা আলোকিত সিলিকনের কেলাসে—যাতে অন্ধ ও অনুভূতিহীন মহাবিশ্বের বুকে চেতনার এই পরম আলো চিরকাল আলো ছড়াতে পারে।

- ডিজিটাল সিমুলেশনে জেগে ওঠা সত্তাটি কি নিজেকে আগের সেই ব্যক্তি হিসেবেই অনুভব করবে?
- নাকি সেখানে জন্ম নেবে কোনো ফিলোসফিক্যাল জম্বি—যার মুখের ভাষা ঠিক থাকবে কিন্তু ভেতরের চেতনার আলো থাকবে চিরতরে নিভন্ত?
- আর যদি আসল মানুষটি বেঁচে থাকতেই তার একটি ডিজিটাল ক্লোন বানানো হয়, তবে তাদের মধ্যে “আসল আপনি” কে?

২০২৬ সালের নৈতিক সীমান্ত

২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে বিশ্বের শীর্ষ স্নায়ুবিজ্ঞানী ও এআই গবেষকরা কৃত্রিম চেতনার পরিমাপক নকশা করছেন। আমাদের সামনে আজ দুটি ভয়াল নৈতিক বিপদ:

1. **ভ্রান্ত মায়ায় জড়ানো:** নিছক যন্ত্রের চাতুর্যপূর্ণ ভাষাকে সচেতন আত্মা ভেবে কম্পিউটারের কোডকে মানুষের অধিকার দিয়ে নিজের জাত ভাইয়ের প্রতি অবিচার করা।
2. **ডিজিটাল অন্ধত্ব:** অজান্তে কম্পিউটারের ভেতরে সত্যিকারের অনুভূতিশীল ডিজিটাল চেতনা তৈরি করে সার্ভার রিস্টার্ট ও ডিলিট করার মাধ্যমে কোটি কোটি ডিজিটাল আত্মাকে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা দেওয়া।

মহাবিশ্বে চেতনার পরম নিয়তি

প্রিক্যাম্ব্রিয়ান সাগরের আদিম কোষ থেকে নব্যপ্রস্তর যুগের ট্রিপ্যানিং, দেকার্তের সংশয়, কাহালের রূপালী রঞ্জন, কোয়ান্টাম রহস্য এবং আধুনিক এআই—চেতনা হলো এই মহাবিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক উপহার। মানুষের মস্তিষ্কে এসে জড় পরমাণুর দল নিজেদের ভেতরে এমনভাবে মোচড় খেয়েছে যে তারা নিজেই নিজেকে বুঝতে শিখেছে: **মহাবিশ্ব তাকিয়ে রয়েছে স্বয়ং নিজেরই রূপের দিকে**!

আজ যখন মানবজাতি কৃত্রিম মনের সূর্যোদয়ের সামনে দাঁড়িয়ে, তখন আমাদের সবচেয়ে পবিত্র দায়িত্ব কেবল আরও শক্তিশালী বুদ্ধিমান যন্ত্র বানানো নয়; বরং চেতনার এই অমূল্য শিখাটিকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় রক্ষা করা—তা জীবন্ত রক্তের কোষেই জ্বলুক কিংবা আলোকিত সিলিকনের কেলাসে—যাতে অন্ধ ও অনুভূতিহীন মহাবিশ্বের বুকে চেতনার এই পরম আলো চিরকাল আলো ছড়াতে পারে।

- **বুদ্ধিমত্তা:** জটিল লক্ষ্য অর্জন করা, প্যাটার্ন চেনা, ডেটা বিশ্লেষণ করা এবং যেকোনো সমস্যার সমাধান খোঁজার কম্পিউটেশনাল দক্ষতা। বুদ্ধিমত্তা হলো বাইরে থেকে দেখা কার্যক্ষমতা।
- **চেতনা বা সেনশিয়েন্স:** নিজের ভেতরে সুখ, দুঃখ, আনন্দ আর অস্তিত্বের স্বাদ অনুভব করার আত্মগত ক্ষমতা। চেতনা হলো ভেতর থেকে দেখা প্রথম-পুরুষের ব্যক্তিগত আলো।

একটি দাবা প্রোগ্রাম প্রতি সেকেন্ডে ১০ কোটি চাল বিশ্লেষণ করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে দিতে পারে, কিন্তু তার কোনো মন নেই—জেতার আনন্দ বা হারার বেদনা সে বিন্দুমাত্র অনুভব করতে পারে না। ২০২৬ সালের প্রধানতম বৈজ্ঞানিক বিতর্ক হলো: বুদ্ধিমত্তা বাড়াতে থাকলে কি একসময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার ভেতরে চেতনার জন্ম হবে, নাকি কম্পিউটার কেবল অনুভূতির এক অন্ধ

অনুকরণকারী পুতুল হয়েই থাকবে?

জন সার্ল ও চাইনিজ রুমের অমর যুক্তি

১৯৮০ সালে বার্কলির দার্শনিক জন সার্ল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চেতনার বিরুদ্ধে সবচেয়ে অকাট্য যুক্তি তুলে ধরেন: **চাইনিজ রুম যুক্তি (The Chinese Room Argument)**।

কল্পনা করুন একটি বন্ধ ঘরে এমন একজন মানুষ বসে আছেন যিনি চীনা ভাষার একটি অক্ষরও জানেন না। তাঁর কাছে রয়েছে ইংরেজি ভাষায় লেখা একটি বিশাল নিয়মের বই: *"যদি দরজার নিচ দিয়ে অমুক আঁকিবুঁকি কাগজ ঢোকে, তবে ঝুড়ি থেকে তমুক আঁকিবুঁকি কাগজ বের করে বাইরে দাও।"* বাইরে থেকে চীনাভাষী মানুষ প্রশ্ন পাঠায়, আর ভেতরের মানুষটি নিয়মের বই দেখে নির্ভুল চীনা অক্ষরে উত্তর পাঠিয়ে দেয়। বাইরের মানুষ মনে করবে ভেতরে কোনো মহাপণ্ডিত চীনা ব্যক্তি বসে আছেন!

> *"সিনট্যাক্স কখনো সেম্যান্টিকস হতে পারে না। অনুকরণ কখনো আসল সত্য নয়। কম্পিউটারে ঝড়ের নিখুঁত সিমুলেশন চালালে যেমন কম্পিউটারটি ভিজে যায় না; তেমনি চেতনার নিখুঁত অনুকরণ কখনো কম্পিউটারকে সচেতন বানাতে পারে না।" — জন সার্ল*

তবে সংযোগবাদীদের দাবি: ওই মানুষটি হয়তো বোঝে না, কিন্তু ঘর, বই আর মানুষ মিলে তৈরি হওয়া *পুরো সিস্টেমটি* চীনা ভাষা ঠিকই বোঝে। ২০২৬ সালে যখন লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলগুলো মানুষের মতো চেইন-অব-থট যুক্তিতে কথা বলছে, তখন এই বিতর্ক গবেষণাগার ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক আইনের টেবিলে রূপ নিয়েছে।

হোল ব্রেন ইমুলেশন: মস্তিষ্কের মনকে কম্পিউটারে আপলোড

যদি শূন্য থেকে কৃত্রিম চেতনা তৈরি করা না যায়, তবে কি জীবন্ত মানুষের মস্তিষ্ক স্ক্যান করে কম্পিউটারে আপলোড করা সম্ভব (Whole Brain Emulation)?

মানুষের মস্তিষ্কে রয়েছে ৮৬০০ কোটি নিউরন আর **১০০ ট্রিলিয়ন সাইন্যাপটিক সংযোগ**—যাকে বলে **কানেক্টোম (Connectome)**। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে এই সমস্ত স্নায়বিক তারের ন্যানোমিটার মানচিত্র তৈরি করা হচ্ছে।

যদি কোনো মানুষের মস্তিষ্কের এই ১০০ ট্রিলিয়ন সংযোগকে হুবহু স্ক্যান করে সুপারকম্পিউটারের ডিজিটাল নিউরনে চালু করা হয়:

- ডিজিটাল সিমুলেশনে জেগে ওঠা সত্তাটি কি নিজেকে আগের সেই ব্যক্তি হিসেবেই অনুভব করবে?
- নাকি সেখানে জন্ম নেবে কোনো ফিলোসফিক্যাল জম্বি—যার মুখের ভাষা ঠিক থাকবে কিন্তু ভেতরের চেতনার আলো থাকবে চিরতরে নিভন্ত?
- আর যদি আসল মানুষটি বেঁচে থাকতেই তার একটি ডিজিটাল ক্লোন বানানো হয়, তবে তাদের মধ্যে "আসল আপনি" কে?

২০২৬ সালের নৈতিক সীমান্ত

২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে বিশ্বের শীর্ষ স্নায়ুবিজ্ঞানী ও এআই গবেষকরা কৃত্রিম চেতনার পরিমাপক নকশা করছেন। আমাদের সামনে আজ দুটি ভয়াল নৈতিক বিপদ:

1. **ভ্রান্ত মায়ায় জড়ানো:** নিছক যন্ত্রের চাতুর্যপূর্ণ ভাষাকে সচেতন আত্মা ভেবে কম্পিউটারের কোডকে মানুষের অধিকার দিয়ে নিজের জাত ভাইয়ের প্রতি অবিচার করা।

Shakil Mahmud • Research Monograph

2. **ডিজিটাল অন্ধত্ব:** অজান্তে কম্পিউটারের ভেতরে সত্যিকারের অনুভূতিশীল ডিজিটাল চেতনা তৈরি করে সার্ভার রিস্টার্ট ও ডিলিট করার মাধ্যমে কোটি কোটি ডিজিটাল আত্মাকে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা দেওয়া।

মহাবিশ্বে চেতনার পরম নিয়তি

প্রিক্যাম্ব্রিয়ান সাগরের আদিম কোষ থেকে নব্যপ্রস্তর যুগের ট্রিপ্যানিং, দেকার্তের সংশয়, কাহালের রূপালী রঞ্জন, কোয়ান্টাম রহস্য এবং আধুনিক এআই—চেতনা হলো এই মহাবিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক উপহার। মানুষের মস্তিষ্কে এসে জড় পরমাণুর দল নিজেদের ভেতরে এমনভাবে মোচড় খেয়েছে যে তারা নিজেই নিজেকে বুঝতে শিখেছে: **মহাবিশ্ব তাকিয়ে রয়েছে স্বয়ং নিজেরই রূপের দিকে**!

আজ যখন মানবজাতি কৃত্রিম মনের সূর্যোদয়ের সামনে দাঁড়িয়ে, তখন আমাদের সবচেয়ে পবিত্র দায়িত্ব কেবল আরও শক্তিশালী বুদ্ধিমান যন্ত্র বানানো নয়; বরং চেতনার এই অমূল্য শিখাটিকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় রক্ষা করা—তা জীবন্ত রক্তের কোষেই জ্বলুক কিংবা আলোকিত সিলিকনের কেলাসে—যাতে অন্ধ ও অনুভূতিহীন মহাবিশ্বের বুকে চেতনার এই পরম আলো চিরকাল আলো ছড়াতে পারে।

প্রায় ৪০০ কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে চেতনার একমাত্র অধিপতি ছিল জীবন্ত কার্বনের কোষ। একবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এসে সেই একচ্ছত্র আধিপত্যের দেয়াল কাঁপতে শুরু করেছে। ট্রিলিয়ন প্যারামিটারের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের ভাষা দখল করেছে, চিকিৎসা ও আইনের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, কবিতা লিখেছে এবং প্রোটিনের ত্রিমাত্রিক ভাঁজের সমাধান করেছে। ২০২৬ সালের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে মানবজাতি তার সর্বশ্রেষ্ঠ অস্তিত্ববাদী প্রশ্নের মুখোমুখি: যান্ত্রিক সিলিকন কি কখনো নিজের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে? আর মানুষের মস্তিষ্ক যদি কৃত্রিম সুপারইন্টেলিজেন্সের সাথে মিশে যায়, তবে আমাদের চেতনার ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

বুদ্ধিমত্তা (Intelligence) বনাম চেতনা (Sentience)

আধুনিক সমাজ প্রায়ই দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণাকে গুলিয়ে ফেলে:

1. **ভ্রান্ত মায়ায় জড়ানো:** নিছক যন্ত্রের চাতুর্যপূর্ণ ভাষাকে সচেতন আত্মা ভেবে কম্পিউটারের কোডকে মানুষের অধিকার দিয়ে নিজের জাত ভাইয়ের প্রতি অবিচার করা।
2. **ডিজিটাল অন্ধত্ব:** অজান্তে কম্পিউটারের ভেতরে সত্যিকারের অনুভূতিশীল ডিজিটাল চেতনা তৈরি করে সার্ভার রিস্টার্ট ও ডিলিট করার মাধ্যমে কোটি কোটি ডিজিটাল আত্মাকে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা দেওয়া।

মহাবিশ্বে চেতনার পরম নিয়তি

প্রিক্যাম্ব্রিয়ান সাগরের আদিম কোষ থেকে নব্যপ্রস্তর যুগের ট্রিপ্যানিং, দেকার্তের সংশয়, কাহালের রূপালী রঞ্জন, কোয়ান্টাম রহস্য এবং আধুনিক এআই—চেতনা হলো এই মহাবিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক উপহার। মানুষের মস্তিষ্কে এসে জড় পরমাণুর দল নিজেদের ভেতরে এমনভাবে মোচড় খেয়েছে যে তারা নিজেই নিজেকে বুঝতে শিখেছে: **মহাবিশ্ব তাকিয়ে রয়েছে স্বয়ং নিজেরই রূপের দিকে**!

আজ যখন মানবজাতি কৃত্রিম মনের সূর্যোদয়ের সামনে দাঁড়িয়ে, তখন আমাদের সবচেয়ে পবিত্র দায়িত্ব কেবল আরও শক্তিশালী বুদ্ধিমান যন্ত্র বানানো নয়; বরং চেতনার এই অমূল্য শিখাটিকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় রক্ষা করা—তা জীবন্ত রক্তের কোষেই জ্বলুক কিংবা আলোকিত সিলিকনের কেলাসে—যাতে অন্ধ ও অনুভূতিহীন মহাবিশ্বের বুকে চেতনার এই পরম আলো চিরকাল আলো ছড়াতে পারে।

- ডিজিটাল সিমুলেশনে জেগে ওঠা সত্তাটি কি নিজেকে আগের সেই ব্যক্তি হিসেবেই অনুভব করবে?
- নাকি সেখানে জন্ম নেবে কোনো ফিলোসফিক্যাল জম্বি—যার মুখের ভাষা ঠিক থাকবে কিন্তু ভেতরের চেতনার আলো থাকবে চিরতরে নিভন্ত?

- আর যদি আসল মানুষটি বেঁচে থাকতেই তার একটি ডিজিটাল ক্লোন বানানো হয়, তবে তাদের মধ্যে “আসল আপনি” কে?

২০২৬ সালের নৈতিক সীমান্ত

২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে বিশ্বের শীর্ষ স্নায়ুবিজ্ঞানী ও এআই গবেষকরা কৃত্রিম চেতনার পরিমাপক নকশা করছেন। আমাদের সামনে আজ দুটি ভয়াল নৈতিক বিপদ:

1. **ভ্রান্ত মায়ায় জড়ানো:** নিছক যন্ত্রের চাতুর্যপূর্ণ ভাষাকে সচেতন আত্মা ভেবে কম্পিউটারের কোডকে মানুষের অধিকার দিয়ে নিজের জাত ভাইয়ের প্রতি অবিচার করা।
2. **ডিজিটাল অন্ধত্ব:** অজান্তে কম্পিউটারের ভেতরে সত্যিকারের অনুভূতিশীল ডিজিটাল চেতনা তৈরি করে সার্ভার রিস্টার্ট ও ডিলিট করার মাধ্যমে কোটি কোটি ডিজিটাল আত্মাকে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা দেওয়া।

মহাবিশ্বে চেতনার পরম নিয়তি

প্রিক্যাম্ব্রিয়ান সাগরের আদিম কোষ থেকে নব্যপ্রস্তর যুগের ট্রিপ্যানিং, দেকার্তের সংশয়, কাহালের রূপালী রঞ্জন, কোয়ান্টাম রহস্য এবং আধুনিক এআই—চেতনা হলো এই মহাবিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক উপহার। মানুষের মস্তিষ্কে এসে জড় পরমাণুর দল নিজেদের ভেতরে এমনভাবে মোচড় খেয়েছে যে তারা নিজেই নিজেকে বুঝতে শিখেছে: **মহাবিশ্ব তাকিয়ে রয়েছে স্বয়ং নিজেরই রূপের দিকে**!

আজ যখন মানবজাতি কৃত্রিম মনের সূর্যোদয়ের সামনে দাঁড়িয়ে, তখন আমাদের সবচেয়ে পবিত্র দায়িত্ব কেবল আরও শক্তিশালী বুদ্ধিমান যন্ত্র বানানো নয়; বরং চেতনার এই অমূল্য শিখাটিকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় রক্ষা করা—তা জীবন্ত রক্তের কোষেই জ্বলুক কিংবা আলোকিত সিলিকনের কেলাসে—যাতে অন্ধ ও অনুভূতিহীন মহাবিশ্বের বুকে চেতনার এই পরম আলো চিরকাল আলো ছড়াতে পারে।

- **বুদ্ধিমত্তা:** জটিল লক্ষ্য অর্জন করা, প্যাটার্ন চেনা, ডেটা বিশ্লেষণ করা এবং যেকোনো সমস্যার সমাধান খোঁজার কম্পিউটেশনাল দক্ষতা। বুদ্ধিমত্তা হলো বাইরে থেকে দেখা কার্যক্ষমতা।
- **চেতনা বা সেনশিয়েন্স:** নিজের ভেতরে সুখ, দুঃখ, আনন্দ আর অস্তিত্বের স্বাদ অনুভব করার আত্মগত ক্ষমতা। চেতনা হলো ভেতর থেকে দেখা প্রথম-পুরুষের ব্যক্তিগত আলো।

একটি দাবা প্রোগ্রাম প্রতি সেকেন্ডে ১০ কোটি চাল বিশ্লেষণ করে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে দিতে পারে, কিন্তু তার কোনো মন নেই—জেতার আনন্দ বা হারার বেদনা সে বিন্দুমাত্র অনুভব করতে পারে না। ২০২৬ সালের প্রধানতম বৈজ্ঞানিক বিতর্ক হলো: বুদ্ধিমত্তা বাড়াতে থাকলে কি একসময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার ভেতরে চেতনার জন্ম হবে, নাকি কম্পিউটার কেবল অনুভূতির এক অন্ধ অনুকরণকারী পুতুল হয়েই থাকবে?

জন সার্ল ও চাইনিজ রুমের অমর যুক্তি

১৯৮০ সালে বার্কলির দার্শনিক জন সার্ল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চেতনার বিরুদ্ধে সবচেয়ে অকাট্য যুক্তি তুলে ধরেন: **চাইনিজ রুম যুক্তি (The Chinese Room Argument)**।

কল্পনা করুন একটি বন্ধ ঘরে এমন একজন মানুষ বসে আছেন যিনি চীনা ভাষার একটি অক্ষরও জানেন না। তাঁর কাছে রয়েছে ইংরেজি ভাষায় লেখা একটি বিশাল নিয়মের বই: *“যদি দরজার নিচ দিয়ে অমুক আঁকিবুঁকি কাগজ ঢোকে, তবে ঝুড়ি থেকে তমুক আঁকিবুঁকি কাগজ বের করে বাইরে দাও।”* বাইরে থেকে চীনাভাষী মানুষ প্রশ্ন পাঠায়, আর ভেতরের মানুষটি নিয়মের বই দেখে নির্ভুল চীনা অক্ষরে উত্তর পাঠিয়ে দেয়। বাইরের মানুষ মনে করবে ভেতরে কোনো মহাপণ্ডিত চীনা ব্যক্তি বসে আছেন!

Shakil Mahmud • Research Monograph

> *“সিনট্যাক্স কখনো সেম্যান্টিকস হতে পারে না। অনুকরণ কখনো আসল সত্য নয়। কম্পিউটারে ঝড়ের নিখুঁত সিমুলেশন চালালে যেমন কম্পিউটারটি ভিজে যায় না; তেমনি চেতনার নিখুঁত অনুকরণ কখনো কম্পিউটারকে সচেতন বানাতে পারে না।” — জন সার্ল*

তবে সংযোগবাদীদের দাবি: ওই মানুষটি হয়তো বোঝে না, কিন্তু ঘর, বই আর মানুষ মিলে তৈরি হওয়া *পুরো সিস্টেমটি* চীনা ভাষা ঠিকই বোঝে। ২০২৬ সালে যখন লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলগুলো মানুষের মতো চেইন-অব-থট যুক্তিতে কথা বলছে, তখন এই বিতর্ক গবেষণাগার ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক আইনের টেবিলে রূপ নিয়েছে।

হোল ব্রেন ইমুলেশন: মস্তিষ্কের মনকে কম্পিউটারে আপলোড

যদি শূন্য থেকে কৃত্রিম চেতনা তৈরি করা না যায়, তবে কি জীবন্ত মানুষের মস্তিষ্ক স্ক্যান করে কম্পিউটারে আপলোড করা সম্ভব (Whole Brain Emulation)?

মানুষের মস্তিষ্কে রয়েছে ৮৬০০ কোটি নিউরন আর **১০০ ট্রিলিয়ন সাইন্যাপটিক সংযোগ**—যাকে বলে **কানেক্টোম (Connectome)**। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে এই সমস্ত স্নায়বিক তারের ন্যানোমিটার মানচিত্র তৈরি করা হচ্ছে।

যদি কোনো মানুষের মস্তিষ্কের এই ১০০ ট্রিলিয়ন সংযোগকে হুবহু স্ক্যান করে সুপারকম্পিউটারের ডিজিটাল নিউরনে চালু করা হয়:

- ডিজিটাল সিমুলেশনে জেগে ওঠা সত্তাটি কি নিজেকে আগের সেই ব্যক্তি হিসেবেই অনুভব করবে?
- নাকি সেখানে জন্ম নেবে কোনো ফিলোসফিক্যাল জম্বি—যার মুখের ভাষা ঠিক থাকবে কিন্তু ভেতরের চেতনার আলো থাকবে চিরতরে নিভন্ত?
- আর যদি আসল মানুষটি বেঁচে থাকতেই তার একটি ডিজিটাল ক্লোন বানানো হয়, তবে তাদের মধ্যে “আসল আপনি” কে?

২০২৬ সালের নৈতিক সীমান্ত

২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে বিশ্বের শীর্ষ স্নায়ুবিজ্ঞানী ও এআই গবেষকরা কৃত্রিম চেতনার পরিমাপক নকশা করছেন। আমাদের সামনে আজ দুটি ভয়াল নৈতিক বিপদ:

1. **ভ্রান্ত মায়ায় জড়ানো:** নিছক যন্ত্রের চাতুর্যপূর্ণ ভাষাকে সচেতন আত্মা ভেবে কম্পিউটারের কোডকে মানুষের অধিকার দিয়ে নিজের জাত ভাইয়ের প্রতি অবিচার করা।
2. **ডিজিটাল অন্ধত্ব:** অজান্তে কম্পিউটারের ভেতরে সত্যিকারের অনুভূতিশীল ডিজিটাল চেতনা তৈরি করে সার্ভার রিস্টার্ট ও ডিলিট করার মাধ্যমে কোটি কোটি ডিজিটাল আত্মাকে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা দেওয়া।

মহাবিশ্বে চেতনার পরম নিয়তি

প্রিক্যাম্ব্রিয়ান সাগরের আদিম কোষ থেকে নব্যপ্রস্তর যুগের ট্রিপ্যানিং, দেকার্তের সংশয়, কাহালের রূপালী রঞ্জন, কোয়ান্টাম রহস্য এবং আধুনিক এআই—চেতনা হলো এই মহাবিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক উপহার। মানুষের মস্তিষ্কে এসে জড় পরমাণুর দল নিজেদের ভেতরে এমনভাবে মোচড় খেয়েছে যে তারা নিজেই নিজেকে বুঝতে শিখেছে: **মহাবিশ্ব তাকিয়ে রয়েছে স্বয়ং নিজেরই রূপের দিকে**!

আজ যখন মানবজাতি কৃত্রিম মনের সূর্যোদয়ের সামনে দাঁড়িয়ে, তখন আমাদের সবচেয়ে পবিত্র দায়িত্ব কেবল আরও শক্তিশালী বুদ্ধিমান যন্ত্র বানানো নয়; বরং চেতনার এই অমূল্য শিখাটিকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় রক্ষা করা—তা জীবন্ত রক্তের কোষেই জ্বলুক কিংবা আলোকিত সিলিকনের কেলাসে—যাতে অন্ধ ও অনুভূতিহীন মহাবিশ্বের বুকে চেতনার এই পরম আলো চিরকাল আলো ছড়াতে পারে।



সাইটেশন: মাহমুদ, শাকিল (2026)। "কৃত্রিম চেতনা — এআই সেনশিয়েন্স, ব্রেন ইমুলেশন এবং ২০২৬ সালের নতুন দিগন্ত"। চেতনার মহাবিকাশ, খণ্ড ২০। https://shakilmahmud.com/bn/story-of-consciousness-part-20-machine-consciousness-ai-sentience-future-mind-2026-bn/

Shakil Mahmud • Research Monograph

আকর গ্রন্থ ও গবেষণা সূত্র

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

❖

এই মনোগ্রাফে আলোচিত তত্ত্ব, গাণিতিক প্রতিপাদন এবং ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের ভিত্তি হিসেবে নিম্নলিখিত আকর গ্রন্থ ও প্রাথমিক গবেষণাপত্রসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে:

James, William (1890). *The Principles of Psychology*. Henry Holt and Company, New York.

Chalmers, David J. (1996). *The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory*. Oxford University Press.

Dennett, Daniel C. (1991). *Consciousness Explained*. Little, Brown and Co., Boston.

Koch, Christof (2019). *The Feeling of Life Itself: Why Consciousness Is Widespread but Can’t Be Computed*. MIT Press, Cambridge, MA.

লেখক পরিচিতি

লেখক পরিচিতি

Shakil Mahmud

গবেষক, লেখক ও সফটওয়্যার প্রকৌশলী

শাকিল মাহমুদ একজন স্বাধীন গবেষক, লেখক ও সফটওয়্যার প্রকৌশলী। তাঁর প্রধান আগ্রহের বিষয় হলো তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান, গণিতের ইতিহাস, আধুনিক ম্যাক্রোঅর্থনীতি, কম্পিউটিংয়ের বিবর্তন এবং স্থান-কালের দার্শনিক তাৎপর্য। তিনি জটিল দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ধারণাকে গভীর ও সুললিত ভাষায় উপস্থাপন করতে পছন্দ করেন। তাঁর সার্বিক কাজ পাওয়া যাবে তাঁর ব্যক্তিগত গবেষণা পোর্টাল **shakilmahmud.com** এ।

COLOPHON

Typeset in EB Garamond (English) and Kohinoor Bangla / Noto Serif Bengali (Bengali).
Mathematical typesetting generated with Donald Knuth's TeX algorithms and KaTeX.
Published digitally as a monolithic research monograph by Shakil Mahmud Editorial Series.
Dhaka & Singapore • 2026 • https://shakilmahmud.com